

PRINTED AND PUBLISHED BY N. MUKHERJEE, B.A.
AT THE ART PRESS
20. BRITISH INDIAN STREET, CALCUTTA

রাজেন্দ্র-জীবনী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীঅভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম্. এ., সি-ই.
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

প্রথম সংস্করণ

[মূল্য এক টাকা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৪	তাহারা	('তাহারা' লুপ্ত)
১১	২০	স্বরস্বতীর	সরস্বতীর
১৩	১	মাননীয়,	মাননীয়া
৬১	৯	খুটিনাটি	খুঁটিনাটি
৭৯	৯	মেঘক্তমূ	মেঘমুক্ত
৮০	৬	নিখুত	নিখুঁত

গ্রন্থকারের নিবেদন

বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থায়, ব্যবসায়-জগতের উজ্জ্বল তারকা ও আত্মচেষ্টার বিস্ময়কর সফলতার প্রতীকস্বরূপ ভারত-বিশ্রুত কর্ম্মবীর স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৌরবময় জীবনী বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এইজন্য মিষ্টার কে, সি, মহীন্দ্র প্রণীত ও ইংরাজীভাষায় সুলিখিত স্যর রাজেন্দ্রের 'ব্যক্তিগত জীবনালেখ্য' অবলম্বন করিয়া, রাজেন্দ্র-জীবনী (প্রথম ভাগ) বাঙ্গলা ভাষায় সম্পাদিত হইল। ইংরাজী-ভাষায় অনভিজ্ঞ বঙ্গীয় জননীবর্গের ও তাঁহাদের আশা-ভরসা-স্বরূপ পাঠনিরত উদীয়মান বালকবৃন্দের উদ্দেশে, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রধানতঃ নিবেদিত হইল। যদি ইহা পাঠ করিয়া কোন মাতার পক্ষে পুত্রের চরিত্রগঠনে ও ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে কিছুমাত্র সহায়তা সাধিত হয়, এবং কোন উচ্চাভিলাষী বালক বক্ষ্যমাণ মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার জন্য অনুপ্রাণিত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করিব।

বঙ্গের ও বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের চিরশুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদ মনস্বী স্যর প্রফুল্লচন্দ্ররায় মহাশয় অনুগ্রপূর্ব্বক তাঁহার অননুকরণীয় সারগর্ভ ভাষায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

[illegible]

বালীগঞ্জ,
কলিকাতা।
মে, ১৯৩৪

ভূমিকা

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতিলক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।"

রাজেন্দ্রনাথের জীবনী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শৈশবে পিতৃহীন দরিদ্র বালককে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইয়াছে। গভীর আত্মবিশ্বাস, অবিচলিত ধৈর্য্য, অদম্য কর্ম্মপ্রেরণা, সর্ব্বোপরি আন্তরিক সততাই তাঁহার সফলতার মূল। ব্যবসার কথায় যে সকল বাঙ্গালীর ছেলে মূলধনের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, রাজেন্দ্রনাথের জীবনী তাহাদের আদর্শ হওয়া উচিত। তরুণ জীবনে মূলধন হাতে দিয়া রাজেন্দ্রনাথকে কেহ ব্যবসা-ক্ষেত্রে পাঠায় নাই। সহায়মাত্রহীন তরুণ যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত উচ্চশিক্ষাও লাভ করিতে পারেন নাই,—তবুও যৌবনে 'প্রাণ দিয়ে দুঃখ স'য়ে আপনার হাতে' যে ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার পরিণত বয়সে তাহাই বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া সমগ্র জাতির গৌরবের উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজেন্দ্রনাথ একজন

প্রকৃত কর্ম্মবীর, ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীজাতির মধ্যে কেহই এ প্রকার সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান পুস্তকখানি বাঙ্গালীজাতির একটী প্রকৃত অভাব মোচন করিয়া আপামর সাধারণকে রাজেন্দ্রনাথের কর্ম্মবহুল জীবনের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক ইহাই আমার কামনা।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

৯২, অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।
২৬-২-১৯৩৪

রাজেন্দ্র-জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্য জীবন

দিগন্ত-বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের মাঝে সারি সারি কুটীর, কোন স্থানে দীর্ঘ তাল বৃক্ষের শ্রেণী কিম্বা আম্রকুঞ্জ, কোথায় বা বাঁশ ঝাড়ের নীচে লতাগুল্মের ঘন সন্নিবেশ, আবার তাহারই পাশে অনাবৃত স্থানে ছোট বড় জলাশয়—তাহার তীরে দিবসের ঘটনা আলোচনা করিবার জন্য পল্লীবাসী যুবা-বৃদ্ধের সমাবেশ—ইহাই বাঙ্গলার পল্লীমাত্রের সাধারণ চিত্র। যে ভ্যাব্‌লা গ্রাম স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান বলিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার প্রাকৃতিক চিত্রও অবিকল এইরূপ। বাংলার যে হাজার হাজার গ্রামে কৃষকগণ সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার আগমনে শুধু একটু বিশ্রাম ও হয়ত বা ক্ষণিক তৃপ্তি লাভ করে, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সেইরূপ একটি সাধারণ ছোট পল্লী ভ্যাব্‌লার অতীত গৌরবের পরিচয়

জন্মস্থানের পল্লী-চিত্র।

দিবার কিছুই ছিল না। কোন লিখিত বিবরণ না থাকিলেও শোনা যায় যে সেই সময়ে ভ্যাব্‌লায় অনধিক দুইশত কৃষক পরিবার ছিল। গত আশী বৎসরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ইহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও ভ্যাব্‌লায়, অন্যান্য বঙ্গপল্লীর মত, মৌসুমী মেঘের ছায়া-শীতল সিক্ত চাঁদোয়ার নীচে পরিপুষ্ট নারিকেল ও তালবৃক্ষের কুঞ্জ, অতীত যুগের মতই, কম্পিত পত্রে মন্দমধুর বাতাস দিতেছে। আর আজিও সেখানে নানা বর্ণে চিত্রিত আকাশ, খেয়ালীর মত, গ্রাম্য লোকের সরল মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

আশী বৎসর পূর্ব্বে ভ্যাব্‌লায় দৈনন্দিন গ্রাম্য-জীবন-প্রণালী কি রকম ছিল তাহা বাক্যে চিত্রিত করা কঠিন কাজ নহে। বলিতে কি, অচল প্রাচী যেন ভারতের গ্রামে

আবেষ্টন সূত্রে কৃষক-জীবন।

গ্রামে মূর্ত্ত হইয়া দেখা দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা মানসনয়নে দেখিতে পাই যে সেই যুগে ভ্যাব্‌লার কৃষকগণ প্রত্যূষে জাগিয়া উঠিয়া কিরূপভাবে নিজ নিজ মাদুরের বিছানা গুটাইয়া রাখিত। সূর্য্যোদয়ে পুরুষগণ তাহাদের স্বল্প-পরিসর জমিতে চাষে ব্যাপৃত থাকিত, আর মেয়েরা পুকুরঘাট হইতে জল তুলিতে, রান্নাঘর ঝাঁড়-পোঁচ করিতে, উনানে আগুন দিয়া তাহার উপর হাঁড়ী বসাইয়া নিকটস্থ ডোবায় গা ধুইতে বা স্নান করিতে ব্যস্ত থাকিত। পূর্ব্বাহ্লে করণীয় কার্য্যের ভিতর যে একটা রূপ ও

ছন্দ (rythm) আছে সে বিষয় কিছুমাত্র না বুঝিয়া, শুধু ধর্ম্মভাবে নারীজাতি প্রত্যহ সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে নিত্যকর্ম্ম আরম্ভ করিত। শিশুগণ তাহাদের নিষ্পাপ কৌতূহলী চক্ষু খুলিয়া আশ্চর্য্য ও মুগ্ধভাবে আর একটি নব দিন আবির্ভাবের মনোহর দৃশ্য দর্শন করিত—তাহাদের আনন্দ-ধ্বনিতেই বুঝা যাইত যে গ্রাম জাগরিত হইয়াছে। গ্রাম্য বালকগণ এ কালের খেলার আনন্দ উপভোগ করিবার কিম্বা অদ্ভূত ঘটনার ও বীরত্বের কাহিনী শুনিবার সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত ছিল বলিয়া, পুষ্করিণীই তাহাদের ক্ষুদ্র কর্ম্মব্যস্ত জীবনে একমাত্র আনন্দ ও উত্তেজনা প্রদান করিত। সন্তরণ তাহাদের সব চেয়ে বড় খেলা ও সব চেয়ে অবিরাম শ্রমের ব্যাপার ছিল। এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি হইলে তাহারা মায়ের ভর্ৎসনা মাথা পাতিয়া লইত। পাঠশালার গুরু মহাশয় তাহাদের আমোদে কোন বাধা দিতে পারিতেন না, কেননা শুধু উচ্চবংশের বালকগণ গুরুমহাশয়ের শাসনাধীন ছিল। অপর দিকে, উর্ব্বর উদার প্রকৃতি, অল্প শ্রমে বয়স্ক কৃষকদিগের জীবিকার আয়োজন করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে আলস্য-পরায়ণ, উদাস-দৃষ্টি ও "কূপ-মণ্ডুক" করিয়া তুলিয়াছিল।

ভ্যাব্‌লা গ্রাম, মহকুমার কেন্দ্র বসিরহাট হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। ইতিহাসে বা কিম্বদন্তীতে এই গ্রামের বিষয়ে কোন অতীত গৌরব-কাহিনী খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না। এই স্বল্পায়তন গ্রামে প্রধানতঃ নিম্ন-শ্রেণীর কৃষক-পরিবার বাস করিত। মুষ্টিমেয় ভদ্র অধিবাসী এক আদালতের কাজ ছাড়া অন্য পেশা তাহারা জানিত না—কাহারও জানাইবার আগ্রহও ছিল না। গ্রামের কোন উদ্যোগী বা ভাগ্যবান্ পুরুষ নিজ সামান্য কৃতিত্বের লক্ষণ দেখিবামাত্র বসিরহাটে উঠিয়া যাওয়া লাভজনক মনে করিত—তারপর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে দূরান্তরে চলিয়া যাইত। কিন্তু এইরূপ দেশান্তর যাওয়ার জন্য তাহারা পূর্ব্বপুরুষের মূলধারা বা পৈতৃক ভিটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইত না। ভ্যাব্‌লা-পরিবারবর্গের অধিকাংশ হিন্দু। একান্নবর্ত্তী পরিবারের জীবনধারা তাহাদের অস্থিমজ্জায় বসিয়া গিয়াছিল। অর্থ-সন্ধানে ধাবিত কোন ভাগ্যবান্ দূরযাত্রীর মাথায় কখন এ সঙ্কল্প আসিত না যে জন্মস্থান-গ্রামের সঙ্গে যে যোগ আছে তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। এই সমস্ত কারণে, যদিও ভ্যাব্‌লার সুসন্তানগণ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং উন্নত জীবিকা উপার্জ্জনের উদ্যমে অল্পবিস্তর সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, নিজ ভ্যাব্‌লা, প্রায় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, সামান্য আবাসপূর্ণ সাধারণ পল্লীমাত্র ছিল। এইরূপ একটি পরিবারে, স্যর রাজেন্দ্রনাথের পিতা ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভ্যাব্‌লার ভদ্রপরিবারের গৃহাশক্তি ও গ্রামানুরাগ।

উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে ভগবানচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল এবং

নিজেও তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি তাঁহাকে কৃতী পুরুষ করিয়াছিল।

পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের চরিত্রের বিশেষত্ব।

উন্নতিশীল মোক্তার বলিয়া বারাসতে তাঁহার বিস্তৃত পসার জমিয়া গিয়াছিল। তিনি পার্থিব ঐশ্বর্য্যে ধনী হইয়াও আপনার মানসিক বা ধর্ম্মগত ভাবের কোন ব্যতিক্রম হইতে দেন নাই। প্রচলিত কুলপ্রথা ও সামাজিক পদ অনুসারে তিনি গৃহদেবতার নিত্য পূজা ও সেবা করিতেন। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও শিক্ষাবশতঃ তিনি একান্নবর্ত্তী পারিবারিক প্রথার উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত প্রচুর অর্থের উপর পরিবারবর্গের সাধারণ দাবী স্বীকার করিতেন। স্বাভাবিক উদারতাবশতঃ তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ বাগান ও পুষ্করিণীসমেত বৃহৎ বসতবাটী নির্ম্মাণে ও জমি কিনিতে ব্যয় করিয়া-ছিলেন।

হিন্দুকুলাচারের নির্দ্দেশ অনুসারে ভগবানচন্দ্রের চির-পোষিত কামনা ছিল যে তাঁহার বংশের ধারা চিরন্তন হইবে এবং তিনি একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া যাইবেন যে তাঁহার অন্তিমে সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পাদন করিবে ও বংশের জীবনপ্রণালী অব্যাহত রাখিবে। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাকে বহুবৎসর নিঃসন্তান ও হতাশভাবে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি পবিত্র ও উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে

জন্মগ্রহণ করায়, কেবলমাত্র ধর্ম্মের অনুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া, বারবার চারিবার বিবাহ করেন। এরূপ বহুবিবাহ, আজিকার দিনে অসঙ্গত মনে হইলেও, অতীত কালের সমাজবিধি, ঘটনাসূত্রে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া, কর্ত্তব্যের মধ্যেই গন্য করিত।

ভগবানচন্দ্রের তিন ভাই ছিলেন। তাঁহারা সকলেই একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিতেন। ভগবানচন্দ্র রামনিধি মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র, এইজন্য পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দচন্দ্র পরিবারের কর্ত্তার প্রাপ্য সমস্ত স্বত্ব ও শাসনশক্তি উপভোগ করিতেন। আনন্দচন্দ্র ভ্যাব্লায় পৈত্রিক বাটিতে থাকিতেন এবং ভগবানচন্দ্র ২৬ মাইল দূরবর্ত্তী বারাসতে বাস করিতেন। তখনকার দিনের একান্নবর্ত্তী পারিবারিক প্রথার শাসনপ্রণালী কত সুদৃঢ় ছিল, তাহা দেখাইতে হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যদিও ভগবানচন্দ্র সকলের চেয়ে অনেক বেশী আয় সংসার খরচে দিতেন (তিনিই পরিবারের মধ্যে একমাত্র উপার্জ্জনকারী ছিলেন কিনা ঠিক বলা যায় না), তথাপি পারিবারিক ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ ও সমাধানে কনিষ্ঠ সরিকের মতই তাঁহার সামান্য মাত্র ক্ষমতা ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দচন্দ্রের মেজাজ বড় রুক্ষ্ম ছিল—বাটীর কর্ত্তা হইয়াও যে তিনি সংসার খরচের জন্য বিশেষ কিছু দিতে পারিতেন না এ জ্ঞান বোধ হয় তাঁহার মেজাজকে

আরও কর্কশ করিয়া তুলিয়াছিল। একসময় ভগবানচন্দ্র, আয়ের অল্পতাবশতঃ, আনন্দচন্দ্রের নিকট পারিবারিক দুর্গোৎসবের খরচ কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন, কেননা এরূপ বিষয়ে কনিষ্ঠের প্রস্তাব জ্যেষ্ঠের নিকট অপমানসূচক উপদেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মহাপূজার দুই দিন আগে বারাসত হইতে ভ্যাব্‌লায় ফিরিয়া, ভগবানচন্দ্র তাঁহার সম্মুখে পৈতৃক বাটীর সদর দরজা বন্ধ দেখিতে পাইলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা রাখিয়া ভগবানচন্দ্র বিনীত ভাবে তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা না করিলেন, ততক্ষণ তিনি গৃহ প্রবেশের অনুমতি পান নাই।

নিঃসন্তান অবস্থায় ভগবানচন্দ্রের প্রথম দুই স্ত্রীর পরলোক গমনের পর তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করেন। কিন্তু তাহাতেও অনেক বৎসর তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই।

জন্ম।

অবশেষে নৈরাশ্যের তাড়নায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেন। ১৮৫৩ সালে তাঁহার চতুর্থ স্ত্রীর একটি কন্যা হইয়াছিল। কিন্তু এক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে, তাঁহার তৃতীয় স্ত্রীর ৩৩।৩৪ বৎসর বয়সে এমন একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল যিনি উত্তরকালে শুধু যে ভগবানচন্দ্রের চিরপোষিত কামনা পূর্ণ করিলেন তাহা নয়, পরন্তু বংশের নাম উজ্জ্বল করিয়া যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকেও গৌরবান্বিত

করিয়া তুলিলেন। ইনিই শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে সার্থকনামা রাজেন্দ্রনাথ।

ভগবানচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন রাজেন্দ্রনাথের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। বালক তখন জানিত না যে কী দারিদ্র্যের উদ্বেগ তাহার স্কন্ধে অর্পিত হইল। বিদ্যাদ্বারা অর্জ্জিত অর্থে মনু-নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও, ভগবানচন্দ্র যা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন সমস্তই একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভাণ্ডারে গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সময় রাজেন্দ্রের মাতার হাতে সামান্য কিছু টাকা ও দুই একটি রৌপ্যপাত্র মাত্র ছিল। কিন্তু তিনি ও তাঁহার পুত্র পারিবারিক সম্পত্তির চার আনা অংশীদার বলিয়া, আহার ও আশ্রয়ের জন্য আপাততঃ তাঁহাদের কোন কষ্ট হইল না। এত শৈশব বয়সে রাজেন্দ্র পিতৃহীন হইয়াছিলেন যে তখন তাঁহার ধন ও দারিদ্র্য সম্বন্ধে কোন ধারণা করিবার ক্ষমতাই ছিল না। তিনি মায়ের একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার দৈনিক জীবনধারার কোন বাস্তবিক ব্যতিক্রম হইল না। তবুও হয়ত একটী স্নেহ-হস্তের অন্তর্ধানে, এমন এক শূন্যতার সৃষ্টি হইল যাহা একদিকে তাঁহার বালকসুলভ নমনীয় মনকে অজ্ঞাতসারে কতকটা কঠিন করিয়া তুলিল, অপরদিকে তাঁহার যা কিছু স্নেহ-ভালবাসার কামনা সমস্ত মায়ের উপর নিবদ্ধ

পিতৃহীন বালক।

হইল। মাতার মধুর ও কোমল প্রভাব পিতার স্নেহযুক্ত শাসনের স্থান অধিকার করিল। ইহার ফলে বোধ হয় রাজেন্দ্রনাথ পরিণত বয়স পর্য্যন্ত সুগভীর সহৃদয়তার প্রভাবাধীন হইয়া রহিয়াছেন।

বালক রাজেন্দ্রনাথ অন্যপ্রকারেও পিতার অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি তখন সেই ভাবনা-বিহীন বয়সে ছিলেন যখন গ্রাম্য-বালকের প্রিয় সরোবর ও সেতু তাঁহাকে ইচ্ছানুরূপ আমোদ প্রদান করিত। তৃপ্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া জীবন যাপন করিতে তাঁহাকে বাধা দিবার কেহই ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পিতার স্নেহপ্রবণ যত্ন অপসৃত হইল, তিনি আমোদ আহ্লাদের অনুসরণ কমাইয়া দিয়া একটু লেখাপড়ার সময় করিয়া লইতে আদিষ্ট হইলেন।

সেইসময় একটি পাঠশালা ভ্যাব্‌লায় একমাত্র শিক্ষাস্থল ছিল। রাজেন্দ্র তাহাতে ভর্ত্তি হইলেন। সেই পাঠশালার অধ্যক্ষ ছিলেন এক গুরুমহাশয়। সেই গুরুমহাশয়ের তদারকে প্রায় ত্রিশটি বালক ছিল। তিনি যে ক্ষুদ্র আটচালায় শিক্ষা দিতেন তাহার অনেক ত্রুটি, ও তাহা নামেমাত্র পাঠ-শালা ছিল। সেখানে প্রত্যহ তাঁহার পড়ুয়ারপাল জড় হইত—শুধু মূল উৎস হইতে বিদ্যাধারা পান করিবার জন্য নয়, বরং তাহা ছাড়া ছোট ছেলেরা অনায়াসে যে সব কাজ করিতে পারে, গুরুমহাশয়ের পরিবারের এ ধরণের

বিদ্যারম্ভ; গ্রাম্যপাঠশালার গুরুমহাশয় ও শিক্ষার পদ্ধতি।

ছোটখাট ফায়-ফরমাস খাটিবার জন্য। প্রাচীন ভারতের বিদ্যালয়গুলির কার্য্যপ্রণালী ও নজীর এইরূপই ছিল। ভ্যাব্‌লা ইহার চেয়ে ভাল কিছু জানিত না। এ যুগেও নবদ্বীপ প্রভৃতি সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্রে, সেই প্রাচীন সনাতন প্রথায় টোলে শিক্ষা দেওয়া হয়। পুরাতন গ্রাম্য পাঠশালায় এমন সব বিষয় শিখান হইত, প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় ব্যাপারের সহিত যাহাদের স্পষ্ট ও নিকট সম্বন্ধ আছে। একটি বিষয়ের উপর বিশেষ করিয়া জোর দেওয়া হইত—যে যাহা কিছু শিখান হইত সমস্তই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে, এবং, বর্ত্তমানযুগের শিক্ষাব্যবস্থায়, যেমন তাহা বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইলে স্মরণের বহির্ভূত হইয়া যায়, সেরূপ ঘটিবে না। শিক্ষার পদ্ধতি প্রধানতঃ তর্কগত ছিল, এবং তাহার প্রসার বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হইলেও, পাঠ্য পুস্তক না থাকায় ও শিক্ষক স্মরণশক্তির চর্চ্চার জন্য জেদ করায়, কঠিন মানসিক শিক্ষা ও শাসন স্বতঃই সম্পাদিত হইত।

মানসিক ব্যায়াম ও শৃঙ্খলা ; গণিতের হেঁয়ালী।

ভ্যাব্‌লার গুরুমহাশয়, অর্থাৎ গ্রামস্থ একমাত্র বিদ্যাভিমানী, মাতৃভাষা ভাল জানিতেন ও মানসাঙ্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তাহার বেশী আর বড় কিছু জানিতেন না। পাঠশালায় যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা স্বভাবতঃই বাংলাভাষার প্রথমপাঠ ও পাটীগণিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজেন্দ্র-

নাথের মনের উচ্চ গ্রহণশক্তি ছিল, এবং এই কয় বৎসরে, গুরুমহাশয় ছাত্রগণের মস্তিষ্ক-চালনার উদ্দেশ্যে যে মানসিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিতে ভালবাসিতেন, রাজেন্দ্র তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দৈনিক অভ্যাস হিসাবে, যে জটিল অঙ্কগুলি কসিবার জন্য গুরু-মহাশয় ছাত্রদিগকে পীড়াপীড়ি করিতেন,—তাহাতে বালক দিগের বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হইত, তাহাদিগকে আমোদ দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শৃঙ্খলাও শিক্ষা দিত। এই দৈনিক অঙ্কগুলির ভিতর, গুরুমহাশয়ের প্রবীণ মস্তিষ্ক-প্রসূত বুদ্ধি-বিভ্রমকর হেঁয়ালী ও রহস্যময় প্রশ্ন অনেক থাকিত।

অসাধারণ স্মরণশক্তির মূল কারণ।

রাজেন্দ্রনাথ যেন স্বভাব পটুতার প্রেরণায় বুদ্ধিবৃত্তির এই অদ্ভুত খেলায় যোগ দিতেন। আজিও তিনি যে অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী এবং যে গুণের সাহায্যে ঘটনাচক্রে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূচনা হইয়াছিল, বাল্যের এই বিশেষ শিক্ষা সেই শক্তি অর্জ্জনের মূলে নিহিত আছে।

পুরাতন পাঠশালার ঋণ রাজেন্দ্রনাথ জীবনে ভুলেন নাই। যখনই তাঁহার সাহায্য করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা হইল,

কৃতজ্ঞতা সূত্রে ক্ষুদ্র পাঠশালার উচ্চ পরিণতি।

সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রথম চিন্তা, সেই মা স্বরস্বতীর পুরাতন পীঠস্থান—যেখানে তাঁহার বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, সেইদিকে ধাবিত হইল। অল্প অনুসন্ধানেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে

পাঠশালার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তখন হইতে তিনি নিজের খরচে তাহা চালাইবার সমস্ত ভার বহন করিতে লাগিলেন। অনেক বৎসর এইরূপ করিবার পর, যখন ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার সাহসিক ব্যবসা ব্যাপারে সুপ্রসন্ন হইলেন এবং তিনি যথেষ্ট অর্থ দিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই পাঠশালাকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পদবীতে উন্নীত করিলেন। ১৯১১ সালে এই বিদ্যালয়ে মধ্য-ইংরাজী পরীক্ষা পর্য্যন্ত শ্রেণী-বিভাগ করিয়া পাঠ আরম্ভ হইল। এই উপলক্ষে প্রকাশ্য উদ্বোধন-উৎসবে, মিষ্টার সোয়ান (তদানীন্তন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট) ও মিষ্টার হর্নেল (বাংলার শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর) সমাগত হইয়াছিলেন। সেই সভায় স্যর রাজেন্দ্র, তিনি যে তাঁহার পুরানো গ্রামের অধিবাসীদিগের শিক্ষাবিধানে সাহায্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তজ্জন্য নিজের আনন্দ প্রকাশ করেন। ১৯২১ সালে এই বিদ্যালয় আরও উন্নত হইয়া ছাত্রদিগের জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। এই উপলক্ষে স্যর রাজেন্দ্র শুধু প্রকাণ্ড বিদ্যালয় বাটী নির্ম্মাণ ও তাহার সহিত বিস্তৃত খেলিবার মাঠ যোগ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, পরন্তু বিদ্যালয়ের সংরক্ষণের জন্য প্রচুর বৃত্তি দান করিলেন। বিদ্যালয়ের নাম এখন "স্যর রাজেন্দ্র এচ্, ই, স্কুল" হইয়াছে। ১৯২৯ সালে যখন বহুমান্যবর বাংলার গভর্ণর (His Excellency Sir Stanley



ভ্যাবলায় নবনির্ম্মিত পারিবারিক ভবন

(১৯২৯)

Jackson) ও মাননীয়, লেডী জ্যাকসন স্যর রাজেন্দ্রের বিশেষ নিমন্ত্রণে একদিন ভ্যাব্‌লায় থাকিয়া নানা গ্রাম্য অনুষ্ঠান দর্শন করেন—যে অনুষ্ঠানগুলির সূচনা ও সংরক্ষণ স্যর রাজেন্দ্রের বদান্যতায় সম্পাদিত—তখন ভ্যাব্‌লা স্কুলও, বঙ্গের লাটসাহেব ও তদীয় পত্নীর পদার্পণে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। আনন্দের বিষয় যে, যে দিবা-ভোজে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ মান্যবর অতিথিদ্বয়ের সম্মানার্থ সমবেত হইয়াছিলেন, সেইস্থলে কেহ কেহ স্যর ষ্টান্‌লীকে নিমন্ত্রণকারীর কর্ণে চুপিচুপি বলিতে শুনিয়াছিলেন যে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির জন্মস্থান ভ্যাব্‌লায় আসা বস্তুতঃ তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে তীর্থযাত্রার সমান।

পূর্ব্ববর্ণিত গুরুমহাশয়ের নিকট যখন রাজেন্দ্রনাথ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, তখন ভ্যাব্‌লার বালক-গণ ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু সেই সময় হইতেই অভিভাবকবৃন্দ, তাঁহাদের বংশধরগণের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা যে অত্যাবশ্যক তাহা ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। কেননা শাসকজাতির ভাষা ভাল করিয়া না জানিলে তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া লাভবান্ হওয়া ও জীবনে উন্নতি করা অসম্ভব। সুতরাং বালকদিগকে ইংরাজীতে শিক্ষিত করা পিতামাতার গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের বিষয় হইয়াছিল।

ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা; কালীগঞ্জে গমন।

আনন্দচন্দ্রের পুত্র ও রাজেন্দ্রের জ্যাঠ্‌তুত ভাই চন্দ্রকুমার, ভ্যাব্‌লার মুখার্জ্জি পরিবারের মধ্যে প্রথম ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে শিখিয়া, প্রায় ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী কালীগঞ্জে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে একটি কাজ পাইলেন। বর্ত্তমানে খুলনা জেলার অন্তর্গত এই কালিগঞ্জের সহিত সে সময় মুখার্জ্জি পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, কেননা এই পরিবার কালীগঞ্জে কতকগুলি ধানের জমীর মালিক ছিলেন—সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় ধান সেখানে উৎপন্ন হইত। কালীগঞ্জ এলাকায়, তাঁহাদের নিকট আত্মীয় নীলকুমার চ্যাটার্জ্জির অনেক ভূ-সম্পত্তি ছিল, এবং তাঁহার হাতেই একান্নবর্ত্তী মুখার্জ্জি পরিবারের বৈষয়িক স্বার্থ ন্যস্ত ছিল। নীলকুমার তাঁহার বালক পুত্রদের শিক্ষার জন্য নিজ বাটীতে একটি ছোট স্কুল স্থাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিযুক্ত একজন ইংরাজী-অভিজ্ঞ শিক্ষক, বালকদিগকে বিদেশী ভাষার গূঢ় তত্ত্বে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নীলকুমারের পরিবারের বাহিরের দু'চারিটি বালকও সেই স্কুলে পড়িবার অনুমতি পাইয়াছিল। নিকট আত্মীয় বলিয়া চন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি নীলকুমারের বাটীতে আদরণীয় অতিথিস্বরূপ থাকিতেন। তিনি ইংরাজী-শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার শিশুপুত্র মতিলালের সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথকেও কালীগঞ্জে লইয়া গেলেন।

রাজেন্দ্র ও মতিলালের মধ্যে খুড়া-ভাইপো সম্পর্ক

ছিল, কিন্তু তাঁহারা প্রায় সমবয়সী ছিলেন। রাজেন্দ্র এক বৎসরের বড় ছিলেন, এবং সেইজন্য ভয়ঙ্কর অভিমানী মতিলালের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। আমরা মানস নয়নে ছবি আঁকিয়া দেখিতে পাই যে রাজেন্দ্র ও মতিলাল, এক শুভদিনে ভাল কাপড় পরিয়া, দধি মিষ্টান্ন খাইয়া ও তাঁহাদের মাতৃদত্ত আশীর্ব্বাদ লইয়া, একত্রে সব প্রথম গুরুমহাশয়ের পাঠশালার দিকে যাইতেছেন। তিন বৎসর পরের চিত্রে আমরা পুনর্ব্বার দেখি যে যথাক্রমে পাকা নয় ও আট বৎসরের দুই উচ্চাভিলাষী কিশোর বালক, ইংরাজীভাষা শিখিয়া দিগ্বিজয় করিবার জন্য, ভ্যাব্‌লা হইতে কালীগঞ্জের দিকে যাত্রা করিতেছেন। সেই বাল্য-বয়সে এই দুইটি বালক যে নিবিড় বন্ধনে মিলিত ছিল তাহা পরিণামে সুন্দর বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। নদীর দুই পারে আড়াআড়ি অবস্থিত রুদ্রপুর ও পুঁড়া নামক দুইটি গ্রামে, দেশকালসুলভ প্রথানুসারে একই দিনে যখন দুইজনের বিবাহ হইল, তখন তাঁহারা সেই বন্ধুতার গাঢ় প্রতিষ্ঠা করিলেন। যতদিন মতিলাল বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন এই স্নেহ ও সৌহার্দ্দ্য একদিনের জন্যও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, ইহার পরিবর্ত্তে স্যর রাজেন্দ্রের হৃদয়ে মতিলালের পরিবারবর্গের জন্য নিবিড় ও দৃঢ়পোষিত স্নেহ চিরজাগরিত হইয়া রহিয়াছে।

অভিন্ন-হৃদয় মতিলাল।

দুর্ভাগ্যক্রমে কালীগঞ্জে রাজেন্দ্রের ইংরাজী শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি সেখানে কয়েক মাস থাকার পরই, বসন্তের মহামারী সে প্রদেশ একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। সেই দূর অতীতে ইংরাজী টীকার বিষয় কেহই জানিত না। এদিকে বাংলা টীকা রাজেন্দ্রের ক্ষীণ শরীরের পক্ষে বিষম অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। তিনি কতদিন ধরিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিলেন—এক দিন এমন হইল যে তাঁহার জীবনের আশা পর্য্যন্ত প্রায় বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। এই অবস্থায় তাঁহার বিধবা মাতা গ্রামান্তরে ভয়ানক উদ্বেগে দিনের পর দিন কাটাইতেন। অবশেষে রাজেন্দ্র একটু সুস্থ হইলে, তিনি তাঁহাকে ভ্যাব্‌লায় ফিরাইয়া আনাইলেন। মায়ের স্নেহ ও অক্লান্ত সেবা-যত্ন রাজেন্দ্রের জীবন ও স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কয়েক মাস তাঁহাকে, পাঠ বন্ধ করিয়া, আলস্যে সময় কাটাইতে হইল।

কঠিন পীড়া ও পাঠ বন্ধ।

কিছুদিনের জন্য গ্রাম্যবালকদিগের জীবন-ধারায় ফিরিয়া আসিয়া, রাজেন্দ্র সন্তরণ-খেলায় বিশেষ মনোযোগ দিলেন। পূর্ব্ব-অভ্যাস বলে ও এখন অবিরাম চেষ্টায়, তিনি এই খেলায় ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া 'সর্দ্দার' হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় তাঁহার দ্বিতীয় বড় খেলা অর্থাৎ মাছ ধরায়

সন্তরণ ও মৎস্য শীকারে অদ্ভুত নৈপুণ্য।

তাঁহার অদ্ভুত নৈপুণ্য, তৎপরতা ও সহিষ্ণুতা পরিস্ফুট হইল। বাঙ্গালী গ্রাম্যবালক যেন জলাশয় ও তাহার সহস্র রহস্যের জন্য স্বাভাবিক অনুরাগ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তরুণ রাজেন্দ্র বাল্যবয়সেই জলাশয় ও তাহার পলায়নপটু আশ্রিত জীবদিগকে জয় করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। যাহাই ঘটুক না কেন, কঠিন বাধা অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি হইত। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষের মধ্যে নেতা হইবার উচ্চাভিলাষরূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গে যুবকবৃন্দের শারীরিক উন্নতি বিধানের সাহায্যের জন্য স্যর রাজেন্দ্র যে অত্যন্ত উদারভাবে অর্থদান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার জীবনব্যাপী ক্রীড়ানুরাগ তাহার মূল কারণ।

ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের অঙ্কুর ও চিরস্থায়ী ক্রীড়ানুরাগ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাবস্থা

স্কুল ও কলেজ

কালীগঞ্জের গৃহশিক্ষা তরুণ রাজেন্দ্রের মনে ব্যাকুলতা ও চঞ্চলতার বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল। যখন তাঁহার পূর্ব্বস্বাস্থ্য প্রায় ফিরিয়া আসিল ও জল-ক্রীড়ায় তাঁহার আগ্রহ একটু পুরাতন হইয়া গেল, তখন তিনি ভাষার রহস্যের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বিদ্যালাভের জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ পাইল। ইংরাজীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ তাঁহার মাতারও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। নিঃস্ব বিধবা হইলেও, রাজেন্দ্রের মাতার অসীম সাহস ছিল। তাঁহার স্মরণ হইল যে তাঁহার স্বামী দয়াপরবশ হইয়া জয়গোপাল মুখার্জ্জি নামক এক ব্যক্তির শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন, এবং পরে তাঁহার বারাসতে চাকরী লাভেও সাহায্য করিয়াছিলেন। অবিলম্বে রাজেন্দ্রের মাতা একজন আত্মীয়ের মারফৎ জয়গোপালকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে ভগবানচন্দ্র তাঁহার জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ, তিনি পিতৃহীন

শিক্ষাবিধানে মাতার চেষ্টা।

বালককে নিজের আশ্রয়ে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে পারিবেন কি না। জয়গোপাল আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এইরূপে পরবর্ত্তী চার বৎসর, রাজেন্দ্রনাথ বারাসতে জয়গোপালের বাটীতে থাকিয়া স্থানীয় স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত, আগ্রহ ও মনোযোগসহকারে পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

বারাসতে ছাত্রজীবন; বালসুলভ চপলতা।

ছাত্রজীবনের এই কয়েক বৎসর, সহজ ও বিশেষ শাসন-বিহীন অবস্থায় রাজেন্দ্রের চরিত্র গঠিত হইতেছিল। সে সময়ের অতি অল্প ঘটনারই উল্লেখ এখন পাওয়া যায়। তখন রাজেন্দ্র ও মতিলাল দুজনেই জগৎ জয় করিবার স্বপ্ন দেখিতেন—অর্থাৎ তাঁহাদের অনভিজ্ঞ মনের ধারণায় হয়ত এক নিশ্বাসে নিকটস্থ নদী পারাপার হওয়া, অথবা একটা পাঁচসের রুইমাছ বঁড়সিতে গাঁথিয়া তোলা। স্কুলের ছুটির পর তাঁহারা অবসর সময় চারিদিকে হাঁটিয়া বেড়াইয়া, কিম্বা ক্রীড়ার ক্ষেত্র জলাশয় হইতে রোমাঞ্চকর আমোদ সংগ্রহ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। হাডু-ডুডু এবং ঐ ধরণের বালকদিগের প্রিয় অনায়াস-রচিত খেলা ছাড়া তখন কোন নির্দ্ধারিত খেলার বিষয় গ্রামের কেহ জানিত না। দুষ্টামী ও বালসুলভ চপলতা এখনকার মতই চলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বর্ণিত ঘটনা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক

হইবে না। রাজেন্দ্রনাথ ও মতিলাল একদিন সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়া দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে এক ফিরিও-য়ালী তাজা সুমিষ্ট কুল বিক্রয় করিতেছে। দুজনে কিছু কুল

কুলের লোভে ছল।

লইবার মতলব ঠিক করিয়া, সাহস ভরে বৃদ্ধার নিকট গেলেন ও দু'চার পয়সার কুল চাহিলেন। অতঃপর রাস্তার ধারে বসিয়া তাঁহারা টপাটপ্ কুল খাইতে লাগিলেন। যখন ফলের ভূরিভোজনে উদর পূর্ণ হইল, তখন দুজনেই হাতে পয়সা নাই বলিয়া বিস্ময়ের ভাণ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে কুলের দাম আনিতে রাজেন্দ্র বাটী যাইবেন ও মতিলাল জামীন স্বরূপ কুলওয়ালীর কাছে বসিয়া থাকিবেন। রাজেন্দ্র যতক্ষণে বাটী পৌঁছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার সাহস অন্তর্হিত হইল। অভিভাবকের নিকট হইতে পয়সা আদায় করা তখন বড় সহজ ছিল না। পয়সা চাওয়ার চেয়ে চুপ করিয়া থাকাই, রাজেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিলেন। এদিকে মতিলাল হাটের কাছে বসিয়া বসিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন। সন্ধ্যা আগত হইল, তবুও বাটীতে মতিলালের দেখা নাই। তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে আসল ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বেতের শাসনও প্রকাশিত হইল। যদিও "চাচা আপনা বাঁচা" এই নীতি রাজেন্দ্রনাথের পক্ষে কঠিন শাস্তির কারণ, বস্তুত ফলের উপর তাঁহার লোভই এই দুষ্টামির

জন্য দায়ী। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনেও, এই অত্যধিক আসক্তির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে কখনও কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার দারস্থ হইয়া শূন্য হস্তে ফিরিয়া যায় নাই, যেহেতু বারাসতের বুড়ী কুলওয়ালীর নিকট ঋণ কি তাঁহার মানস-পথে সর্ব্বদাই উদিত হয় না ?

অতি প্রয়োজনীয় বায়ু-পরিবর্ত্তন।

সম্ভবতঃ বাংলা টীকা দেওয়ার ফলে এবং বারাসতে বারবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায়, ক্রমশঃ রাজেন্দ্রের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছিল। ইহার উপর উচ্চ আগ্রহজাত কঠিন পাঠশ্রমে তাঁহার জীবনী শক্তিরও অযথা অপচয় ঘটিয়াছিল। ভ্যাব্‌লায় পারিবারিক ভবনে এই অবস্থার কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, রাজেন্দ্রের মাতা ভীতা হইয়া এক বৃদ্ধ কবিরাজকে ডাকাইলেন। কবিরাজ পরামর্শ দিলেন যে বালকের জীবন রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে দীর্ঘকাল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অবিলম্বে এমন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইতে হইবে যেখানে বারি-বর্ষণ বিরল। তখন নিজ ভ্রাতার বিষয় রাজেন্দ্রের মাতার মনে পড়িল। এই ভ্রাতা—পণ্ডিত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য, অল্প বয়সেই, তাজমহলের প্রসিদ্ধ বাসভূমি আগ্রায় প্রবাসী হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণোচিত দীক্ষিত পুরোহিতের পেশা অবলম্বন করিয়া, আগ্রায় এক বৃহৎ কালীবাড়ী

নির্ম্মাণ করেন ও কালীমন্দিরে দেবী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

মাতুল-প্রতিষ্ঠিত আগ্রার কালীবাড়ী।

পরিণামে এই কালীবাড়ী, চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলার মধ্যে বাঙ্গালীদিগের পূজা ও মিলনের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে দূরাগত বাঙ্গালী পরিবারের পক্ষে আতিথ্য ও অন্যবিধ সাহায্য অনায়াসলভ্য ছিল।

সুদূর আগ্রা যাত্রার সূচনা।

পুত্রের কল্যাণের জন্য রাজেন্দ্রনাথের মাতা, ভ্রাতার স্নেহ উদ্রেক করিতে অবিলম্বে আগ্রায় তাঁহার নিকট পত্র পাঠাইলেন। কোন হিন্দু যে এরূপ স্নেহের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহা কল্পনার অতীত। পণ্ডিত দ্বারকানাথ অবশ্য রাজেন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ আগ্রায় তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। এ পর্য্যন্ত রাজেন্দ্রের মাতা এই বিষয়ের কাজের দিকটী ভাবিয়া দেখেন নাই। বার-তের বৎসরের একটি বালক—যে কখন কালীগঞ্জ ও বারাসাত ছাড়া নিজ গ্রামের বাহিরে আর কোন সহর বা গ্রাম দেখে নাই, যে আজীবন আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়ে বাস করিয়াছে, এরূপ অপরিপক্ক অনভিজ্ঞ ও সুকুমার বয়স্ক বালক কেমন করিয়া সে সময়ের বিপদসঙ্কুল আটশত মাইল পথ একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করিয়া, এক অজানিত ভবনে উপনীত হইতে পারিবে? তারপর অর্থসমস্যা—নগদ টাকা পরিবারের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য ছিল। কিন্তু একই চিন্তা রাজেন্দ্রের মাতার চিত্ত অধিকার



পুত্রপ্রাণা বীরা জননী
(স্বর্গীয়া ব্রহ্মময়ী দেবী)

করিয়াছিল—অর্থাৎ পুত্রের মঙ্গল ও প্রকৃত শিক্ষা। হিন্দু মাতাগণ পুত্রদিগের জীবনে নিজ নিজ অস্তিত্ব মিশাইয়া দেন। তাঁহাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের প্রায় প্রত্যেকটি কার্য্য সন্তানগণের কল্যাণ ও উন্নতি-কল্পে নিবেদিত হইয়া থাকে; বিশেষ পিতার অবর্ত্তমানে, মাতৃভাব আরও গভীররূপে পুত্রের জীবনে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। মাতৃজাতির মধ্যে ভ্যাব্‌লার এই অত্যদ্ভুত মাতা বিশেষ সম্মানের যোগ্যা, যেহেতু নৈষ্ঠিক হিন্দু বিধবা হইয়া এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভিতর প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় থাকিয়াও, একমাত্র পুত্রকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য সুদূর প্রবাসে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। অন্য কারণেও তিনি এই মীমাংসা করিতে বাধ্য হইলেন, কেন না ইতিমধ্যে জয়গোপাল মুখার্জ্জির মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সেইজন্য বারাসতে রাজেন্দ্রের থাকিবার কোন স্থান ছিল না। সেই দুর্গম পথ ও অশেষ কষ্টকর ভ্রমণের যুগে, এক অতুল সাহসী মাতা আপনার বার-তের বৎসর বয়সের একমাত্র নাবালক পুত্রকে দীর্ঘকালের জন্য বিদায় দিয়া, তাহার শিক্ষার সাধনাব্রত সফল হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপারের মূলে ছিল এই মহীয়সী মহিলার কোমল অন্তঃকরণের সহিত প্রবল ইচ্ছাশক্তির সুদুর্ল্লভ যোগ। তিনি নিজ স্বভাবের বিশিষ্ট

পুত্রপ্রাণা সাধারণ হিন্দু মাতা।

ব্যক্তিত্বে অসাধারণ বীরা জননী।

ছাপ পুত্রের চরিত্রের উপরও রাখিয়া গিয়াছেন। অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে, এই দেশবিখ্যাত পুত্র, নিজ বাল্যজীবনের কতকগুলি ঘটনা স্মরণ উপলক্ষে সংক্ষেপে মাতার প্রাপ্য সম্মান দিয়া বলেন, "তিনি অদ্ভুত প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন।"

পথের কষ্ট—বালকের পক্ষে অশ্রুতপূর্ব্ব।

এক শুভ প্রভাতে, বালক রাজেন্দ্র, একটী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, ভ্যাব্‌লা হইতে তাঁহার দুঃসাধ্য দীর্ঘ ভ্রমণের পথে যাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল ও উচ্চাশাপূর্ণ—বিদায়ের বেলা তাঁহার মাতার আত্মসংযম যাত্রাপথে তাঁহার পক্ষে সহায় ও শান্তিদায়ক হইয়াছিল। তিনি ছাব্বিশ মাইল হাঁটিয়া বারাসতে উপস্থিত হইলেন। আরও আট মাইল পথশ্রমের পর, ভৃত্য ও তাহার বালক প্রভু নবাবগঞ্জে (ব্যারাকপুর) উপনীত হইলেন। সেখানে রাজেন্দ্রের মাতুলের, অর্থাৎ তাঁহার বিমাতার (ভগবানচন্দ্রের চতুর্থ স্ত্রীর) ভ্রাতার নিবাস ছিল। এই চৌত্রিশ মাইল পথ হাঁটিতে দুজনের তিন দিন তিন রাত্রি লাগিয়াছিল—তাহার মধ্যে একরাত্রি পথপার্শ্বে মুক্ত প্রান্তরেই অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মাতুল যোগেশ্বর গাঙ্গুলীর স্নেহ ও আদর অভ্যর্থনায় ক্ষুদ্র বালক পদব্রজে ভ্রমণের সমস্ত কষ্ট শীঘ্রই ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কোমল মনে একটি সানন্দ ঋণের ছবি চিরমুদ্রিত হইয়া রহিল। স্যর রাজেন্দ্র জীবনে এই সাদর

অভ্যর্থনার কথা ভুলেন নাই—আজিও যোগেশ্বর গাঙ্গুলীর পুত্র ও পরিবার তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যুপকার পাইয়া থাকেন। ভাগিনেয়ের উপর স্পষ্টতঃই মাতুলের বিলক্ষণ স্নেহের উদ্রেক হইল—তিনি বালককে কিছুদিন নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। ভৃত্য যে ছোট থলীতে রাজেন্দ্রের জন্য সামান্য কয়খানি কাপড় ও বই আনিয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া দেখা হইল ও শীতকালের উপযোগী গরম কাপড় তাহাতে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। রাজেন্দ্র যাহাতে গঙ্গার খেয়াপার হইয়া বৈদ্যবাটী যাইতে পারেন, তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত যোগেশ্বর করিয়া দিলেন। রাজেন্দ্রের মাতার হাতে কেবলমাত্র পুত্রের জন্য আগ্রা পর্য্যন্ত একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিবার ও রাহা খরচের জন্য বড় পুঁজি তিন টাকা দিবার মত অর্থ ছিল। ভৃত্য নবাবগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সে এবং তাহার বালক প্রভু কেমন করিয়া চৌত্রিশ মাইল পথ হাঁটিয়া অতিক্রম করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিল, এবং যোগেশ্বর গাঙ্গুলী গঙ্গা পার করিয়া দিবার যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাও বলিল। পথের কষ্টের কথা শুনিয়া মাতা আর আত্মসংযম রক্ষা করিতে পারিলেন না—তাহার উপর গাড়ীর কাল্পনিক কষ্টের কথা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া, তিনি আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পথিমধ্যে অপর মাতুলের অপার স্নেহ।

এই অবস্থায় তিনি চব্বিশ ঘণ্টার বেশী রহিলেন, এবং যদিও পরে তাঁহার স্বাস্থ্য ও সাহস ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিল, এই ঘটনা তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলের উপর এমন কঠোর আঘাত করিয়াছিল, যে ইহার পর হইতেই মাঝে মাঝে তাঁহার 'ফিট' হইত।

পুত্রের ক্লেশে মাতার ব্যথা ও মূর্চ্ছারোগ ; অদ্ভুত আরোগ্য।

এই স্থানে, দ্বিতীয় বিচিত্র ঘটনা হিসাবে, বলা যায় যে যদিও অপস্মার রোগ, পরবর্ত্তী উদ্বেগবশতঃ তাঁহার জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল, তথাপি রাজেন্দ্রনাথ যখন পল্‌তা জলকলে ঠিকার কাজ পাইবার পর, তাঁহার সৌভাগ্য-সোপানের প্রথম ধাপে পঁহুছিয়া, মাতাকে বারাকপুরে নব-প্রস্তুত প্রথম বাস-ভবনে লইয়া আসিলেন, তখন এই রোগ সহসা অন্তর্হিত হইল। পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে যে স্নায়ুমণ্ডল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় বিষম আন্দোলিত হইয়াছিল, পুত্রের জীবনে সমৃদ্ধির প্রথম সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেন তাহার পক্ষে আনন্দের সঞ্জীবনী সুধা হইয়া উঠিল !

আগ্রায় রাজেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এখন পাওয়া যায় না। তিনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া, সেণ্টজন্‌স কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, এবং অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞ তাঁহার প্রবীন মাতুল, স্নেহাস্পদ ভাগিনেয়ের মনের ক্রমবিকাশ ও উন্নতিসাধনে এবং তাঁহার চরিত্র-গঠনে সহায়তা করিয়া আনন্দ লাভ

করিতেন। সেই অল্প বয়সেই, রাজেন্দ্রনাথের চরিত্রে চালনা-শক্তির ও কার্য্য-সম্পাদনে উপায়-আবিষ্কার-শক্তির সূচনা দৃষ্ট হইয়াছিল। যদিও পাঠ্যপুস্তক তাঁহার প্রায় সারাদিনের সঙ্গী ছিল, তথাপি আগ্রা যাহার জন্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সৌন্দর্য্যের সেই মহান্ নিত্য তীর্থের দিকে তিনি নিশ্চয়ই সান্ধ্যভ্রমণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেন। তাজমহল মানুষের ইন্দ্রিয়বর্গের উপর সুষমা ও সৌষ্ঠব-সম্ভূত প্রবল প্রভাব বিস্তার করে—ইহার অভ্যন্তরে এমন এক মোহিনী-শক্তি নিহিত আছে যাহা বর্ণনার অতীত, এবং যাহা প্রত্যেকবার দর্শনে বৃদ্ধিলাভ করে। সেই সুকুমার বয়সে যখন রাজেন্দ্র, এক সম্রাটের অবিনশ্বর প্রণয়ের স্মৃতিরক্ষক স্বরূপ, ক্ষীণাঙ্গী পরীর মত সুদীর্ঘ ও সুদর্শন মস্‌জিদ চূড়ার (minarets) দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন, তখন কি তিনি স্বপ্ন দেখিতেন যে নিজ উচ্চাভিলাষ রূপ উপাদান লইয়া একদিন সমতুল্য অমর প্রতিরূপ গড়িয়া তুলিবেন? তাজ নিশ্চয়ই অননুকরণীয়, কিন্তু যে মহাপ্রতিভা ও অদ্ভুত কলানৈপুণ্য এই সুষমা ও সৌষ্ঠবের সমুজ্জ্বল মন্দির গঠন করিয়াছিল, তাহার উদ্দেশে বিনীত সম্মান প্রদর্শন, স্বপ্নের বিষয় হইতে পারে। আমরা বিস্ময়ভরে কল্পনা করি যে হয়ত সাজাহানের প্রসিদ্ধ দুর্গের উচ্চ অঙ্গনসমূহ,—যাহার পার্শ্বস্থ

আগ্রায় ছাত্রজীবন ও চরিত্র-গঠন।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণে তাজের সূক্ষ্ম সম্বন্ধ।

প্রগ্রীব (balcony) হইতে তাঁহার প্রণয়-পরিমল অনুক্ষণ যমুনার উদ্দাম তরঙ্গ পার হইয়া প্রিয়তমা রাজ্ঞীর শান্তি-ময় অমরধামের দিকে প্রবাহিত হইত—সেই দৃশ্যের অন্তরলগ্ন মাধুরী রাজেন্দ্রের তরুণ ভাবপ্রবণ মনে এমন সজীব বীজ স্থাপনা করিল, যে তাহা পরিণামে অঙ্কুরিত ও ফলিত হইয়া বঙ্গ-গৌরবকর বিখ্যাত ইন্‌জিনিয়ারিং পরাক্রমরূপে প্রতিভাত হইল। কাহার সাধ্য দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করে—যে দৈব পঞ্চদশবর্ষের এক চিন্তাশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালকের পদবিক্ষেপ, স্থাপত্য-শিল্পের পরম ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সম্রাটবর্গের প্রাচীন রাজধানীর দিকে চালিত করিল এবং তাঁহার উচ্চাশাপূর্ণ হৃদয়ে অলৌকিক প্রেরণা ঢালিয়া দিল? আমরা বিস্মিত অথচ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়া উঠি যেহেতু রাজেন্দ্রনাথ সেই অনুভবক্ষম কোমল বয়সে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যের অনন্তধারা আকণ্ঠ পান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং এইরূপে, যে মুখ্য প্রতিভা পরিণামে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা সহরকে সুন্দররূপে কল্পিত ও সুনির্ম্মিত প্রাসাদসমূহে সজ্জিত করিয়াছে, তাহার প্রথম ছাঁচ আবির্ভূত হইয়াছিল।

আগ্রার দিনগুলি রাজেন্দ্রনাথের পক্ষে পরম সুখের স্মৃতি হইয়া রহিয়াছে। তিনি মাতুলের স্নেহময় তত্ত্বাব-ধানে, প্রায় তিন বৎসর কাটাইয়া দিলেন। তিনি ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, এমন সময়

হঠাৎ পণ্ডিত দ্বারকানাথ এই মর্ম্মে এক জরুরী তার পাইলেন যে রাজেন্দ্রের মাতার অতি কঠিন পীড়া এবং পুত্রকে যেন তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন আশু আগ্রা-ত্যাগ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। মাতার জন্য দুশ্চিন্তায় ও আসন্ন পরীক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া হতাশায় অভিভূত অন্তঃকরণে রাজেন্দ্রনাথ বাটীর দিকে যাত্রা করিলেন। বাটী পৌঁছিয়া যখন দেখিলেন যে সেই টেলিগ্রামটি ছলমাত্র, তখন তাঁহার যেমন সাতিশয় বিস্ময় হইল তেমনই বিরক্তিরও সীমা রহিল না। তাঁহার বয়োঃজ্যেষ্ঠগণ, সেই কিশোর বয়সেই তাঁহার প্রবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয় জানিয়া, বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ভ্যাব্‌লায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য এই কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সেই অল্পবয়সেই রাজেন্দ্র তাঁহার সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বিবাহের কল্পনায় বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবারবর্গ একবার তাঁহাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, এবং এ বিষয়ে তাঁহার কোন স্বাধীন মতও চলিল না। বংশানুগত প্রথা অনুসারে আগে হইতেই পাত্রী ঠিক করা ছিল। রাজেন্দ্রের বয়স আঠার বৎসর হইতে না হইতেই তিনি একদিন দেখিলেন যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

অকস্মাৎ আগ্রাত্যাগ—কৌশল-ফলে।

অনিচ্ছায় বাল্যবিবাহ সম্পাদন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রাজেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ-উৎসব শেষ হইবার কিছু পরেই, পাঠের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠান হইল। সেই সময় ভগবানচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্র, অর্থাৎ রাজেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে কলেক্টরের কার্য্য করিতেন। তিনি রাজেন্দ্রের চেয়ে দশ বৎসরের বড় ছিলেন, এবং কয়েক বৎসর চাকরী করার ফলস্বরূপ তাঁহার বেশ আয় দাঁড়াইয়াছিল। রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে লণ্ডন মিসনারি সোসাইটির ইনষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি হইলেন, এবং যোগেন্দ্রনাথের বাসায় থাকিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মতিলালও কলিকাতায় আসিয়া সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। উভয়েই যথাসময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সেই সময়ে অনেক হিন্দু অভিভাবক, সুশিক্ষার জন্য বালকদিগকে খৃষ্টীয় মিসনারী স্কুলে পাঠাইতে চাহিতেন। আগ্রার যে সেণ্টজন্‌স কলেজে রাজেন্দ্রনাথ প্রথম নিয়মিত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাও খৃষ্টীয় অনুষ্ঠান। এইজন্য তিনি খৃষ্টীয়ান শিক্ষাগুরু ও শিক্ষালয়ের নিকট তাঁহার বাল্যবয়সের ঋণ সর্ব্বদা মনে রাখেন, এবং এরূপ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ কর্ত্তৃপক্ষ কোন প্রার্থনা করিলে,

ভবানীপুরে লণ্ডন মিসনারী ইনষ্টিটিউসনে প্রবেশ ; ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

খৃষ্টীয়ান শিক্ষালয়ের ঋণ স্মরণে কৃতজ্ঞতা।

বদান্যভাবেই তাহা পূরণ করেন। ভবানীপুরস্থ লণ্ডন মিসনারী সোসাইটীর ইনষ্টিটিউসন, ইহার অন্যতম প্রসিদ্ধ পুরাতন ছাত্র বলিয়া, স্যর রাজেন্দ্রের নাম আজিও প্রীতিভরে স্মরণ করে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রাজেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজের ইন্‌জিনিয়ারিং বিভাগে ও মতিলাল মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিলেন। তখনও দুজনে বেলতলায় যোগেন্দ্রনাথের বাসায় থাকিতেন।

বাংলাদেশে ফিরিয়া রাজেন্দ্রের স্বাস্থ্য আবার বিলক্ষণ ক্ষুণ্ণ হইল। স্ফোটক রোগের বিষম আক্রমণে তাঁহার ঘুন্‌ঘুনে মৃদু জ্বর হইতে লাগিল। রাজেন্দ্র ও মতিলাল দুজনেই প্রত্যহ বেলতলা হইতে ছয় সাত মাইল দূরে নিজ নিজ কলেজে যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে প্রত্যেকে এক আনা হইতে দেড় আনা অবধি দিয়া, ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত সেয়ারে ঠিকা গাড়িতে আসিতেন, এবং সেখান হইতে পটলডাঙ্গাস্থিত কলেজ পর্য্যন্ত হাঁটিতেন। বৈকালে দু'টি বালকই কলেজ স্কোয়ার হইতে ভবানীপুর বেলতলা পর্য্যন্ত সমস্ত পথ হাঁটিয়া বাটী ফিরিতেন, কেননা সকালের মত সেয়ারের গাড়ি ভাড়া দিবারও অর্থ থাকিত না। বাটীর বাহিরে আহার বা জলখাবারের জন্যও

অশেষ কষ্টে কলেজে শিক্ষা।

কোন সঙ্গতি তাঁহাদের ছিল না—সকালে নয়টার সময় প্রাতরাশের পর একেবারে রাত্রি আটটার সময় আবার আহার করিতে পাইতেন। যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির বৃহৎ পোষ্য পরিবার ছিল বলিয়া, অন্য বিষয়ে অনেক খরচ থাকা সত্ত্বেও, তিনি দুটী বালকের জন্য যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিতেন, অর্থাৎ তাঁহাদের শিক্ষা, পুস্তক ও পরিধান-বস্ত্র ইত্যাদির খরচ দিতেন। তাঁহাদের ছাত্রজীবনের এক সঙ্গীন সময়ে সাহায্যের জন্য, যোগেন বাবুর নিকট যে তাঁহারা কত ঋণী, তাহা পরবর্ত্তী জীবনে উভয়ে সর্ব্বদা স্নেহভরে স্মরণ করিতেন।

১৮৫৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে যে ইন্‌জিনিয়ারিং বিভাগ উন্মোচিত হইয়াছিল, রাজেন্দ্রনাথ তাহাতে ১৮৭২ সাল হইতে প্রায় তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষার অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিলনা। এইরূপ বাধা ও শত অসুবিধা সত্ত্বেও, এই তিন বৎসরে রাজেন্দ্রনাথের মনে যথার্থ ইন্‌জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের প্রতি প্রকৃত ও প্রগাঢ় অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। এবিষয়ে তিনি ভ্যাব্‌লার গুরুমহাশয়ের নিকট ঋণী, কেননা তিনিই প্রথমে মানসাঙ্ক এবং গণিতের হেঁয়ালী ও কূট প্রশ্নের চর্চ্চাদ্বারা বালক রাজেন্দ্রের উর্ব্বর ও নমনীয় মনে এইরূপ মূলতত্ত্ব বিষয়ক অনুরাগের বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্‌জিনিয়ারিং

কলেজের তদানীন্তন শিক্ষা-প্রণালী এইরূপ ছিল যে ইহাতে কেবল মাত্র সরকারী পূর্ত্তবিভাগের অধঃস্তন কর্ম্মচারী ও ওভারশিয়ারের শূন্য পদ পূরণ করিবার জন্য ছাত্রদিগকে শিক্ষিত করা হইত। ইন্‌জিনিয়ারিং-বিদ্যা, ব্যবসায় হিসাবে শিক্ষা দিবার কোন চেষ্টা করা হইত না—উচ্চ পেশা হিসাবে ত দূরের কথা। সুতরাং এই শিক্ষার সাহায্যে সেই যুগে ইন্‌জিনিয়ারিং বিদ্বৎ-মণ্ডলী ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সে সময়ের শিক্ষা-গুরুগণ ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষাকে, নির্দ্ধারিত আয়ের আশায় সরকারী কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্রস্বরূপ মনে করিতেন—শিক্ষাদ্বারা যে তরুণ মনে প্রজ্ঞাজাত সম্ভ্রমবোধ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারা যায়, এবং বিশেষ ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষা যে প্রাকৃতিক উপাদান সাহায্যে নানাবিধ শিল্প-সৃষ্টির প্রধান উপায়, তাহা বুঝিবার মত কল্পনা-শক্তি তাঁহাদের ছিল না।

ইন্‌জিনিয়ারিং বিজ্ঞানানুরাগ; তদানীন্তন শিক্ষার হীনাবস্থা।

শেষ পরীক্ষা দিয়া ইন্‌জিনিয়ারিং উপাধিপত্র (degree) লাভ করিবার পূর্ব্বেই, রাজেন্দ্রের স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটিল। তাঁহার পুরাতন জ্বর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার শরীর অধিকার করিয়া বসিল। অতএব বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পাঠ বন্ধ করিতে ও কলেজ ছাড়িয়া দিতে

রোগে, দৈন্যে কলেজে পাঠ অসমাপ্ত; আশু জীবিকার্জ্জনের প্রয়োজন বোধ।

হইল। আর্থিক বাধা-বিপত্তি ও ক্রমবর্দ্ধমান অনুগ্রহ-বোধ তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইয়া ছিল। দায়ীত্বপূর্ণ বিবাহিত অবস্থায়, অবিলম্বে জীবিকা-উপার্জ্জন আরম্ভ তাঁহার পক্ষে প্রায় অবশ্য করণীয় হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিকূল অবস্থায় বিশেষত্ব ; কঠোর জীবন-সংগ্রাম

যোগেন মুখার্জ্জির এক বন্ধু বাংলা সরকারের চীফ্ ইন্‌জিনিয়ারের অফিসে প্রধান কেরাণীর কার্য্য করিতেন। তিনি রাজেন্দ্রনাথের জন্য একটী বৃহৎ 'বিলের' প্রস্তাবিত সর্‌ভেয়ারের পদ সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির জরীপের কার্য্যে যে কঠিন জীবন যাপন করিতে হইবে তাহা রাজেন্দ্রের ভগ্ন স্বাস্থ্যের পক্ষে সঙ্গত হইবে না, কতকটা এই কারণে, কিন্তু প্রধানতঃ কোন প্রভুর অধীনে কার্য্য করিবার বিরুদ্ধে তাঁহার অন্তর্নিহিত বিতৃষ্ণাবশতঃ, তিনি এই চাকরী লইতে পারিলেন না—যদিও লইবার অনুকূলে গুরুতর প্রলোভন ছিল, কেন না একজন উপাধি-বিহীন অনভিজ্ঞ ছাত্রের পক্ষে এই পদের বেতন অপেক্ষাকৃত প্রচুর ছিল, এবং এই পদ গ্রহণ করিলে রাজেন্দ্র ও তাঁহার পরিবারবর্গ তৎক্ষণাৎ আর্থিক অসচ্ছলতার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহার অন্তরঙ্গ ও প্রধান পরামর্শদাতা এক মতিলাল ভিন্ন তাঁহার

স্বাধীন মনোবৃত্তি ; লোভনীয় চাকরী প্রত্যাখ্যান।

পরিবারের আর কেহই মনে করেন নাই যে তিনি এরূপ আশাতীত বেতনের পদ প্রত্যাখ্যান করিবেন, কিন্তু বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং সেই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। একবার নিষ্পত্তি করিয়া তিনি নিজ সঙ্কল্পে অটল রহিয়া গেলেন। ইহা শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। যখন তাঁহার ভয় প্রদর্শন ও অনুরোধে কোন ফল হইল না, তখন তিনি রাজেন্দ্রনাথকে এক প্রকার গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া বলিলেন যে অতঃপর তিনি তাঁহার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবেন না। এই বিপদে ভীত না হইয়া, বরং নিজের স্বাধীন কর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, রাজেন্দ্র বেলতলা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মতিলালের সহিত ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকটস্থ একটী মেসে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। মতিলাল ও তাঁহার বন্ধুবর্গের সাহায্যে, রাজেন্দ্রনাথ অবশেষে একটী অনাথ বালিকাশ্রমে গণিতের সাময়িক শিক্ষকরূপে কার্য্য পাইলেন। তিনি প্রত্যহ দুই ঘণ্টার জন্য শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার মাসিক পনর টাকা আয় হইত, এবং এই টাকায় তাঁহার মেসে জীবন-যাত্রার সামান্য খরচ মাত্র সঙ্কুলান হইয়া যাইত।

দেখিতে দেখিতে রাজেন্দ্রের বিবাহিত জীবনের প্রথম



অভিন্নহৃদয় মতিলাল

(স্বর্গীয় ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায়)

(প্রবীন বয়সে)

চারিটী বৎসর কাটিয়া গেল। এই অবস্থার দায়ীত্ব যে ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়, এবং বিনা আয়ে বা অল্প আয়ে সেই দায়ীত্ব পূরণ করিতে হইলে যে কত অসুবিধা সহ্য ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহা রাজেন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা ও স্ত্রী, সুখে স্বচ্ছন্দে না থাকিলেও, একান্নবর্ত্তী পরিবারের আশ্রয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবেক তাঁহাকে, এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে না দিয়া, অস্থির করিয়া তুলিল।

বাল্যবিবাহের অশুভ ফল।

কোন সমাজের গঠন ও প্রচলিত আচার ব্যবহারের উপর, তাহার শুভাশুভ কি পরিমাণে নির্ভর করে সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু বৈদিক যুগে প্রচলিত যৌবন-বিবাহের স্থলে ভারতে যে বাল্য-বিবাহ ঘটনাচক্রে পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে অনুপ-যোগী ও অনিষ্টকর বলিয়া অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রচেষ্টাও চারিদিকে হইতেছে। বিশেষ বঙ্গে প্রচলিত বাল্যবিবাহ প্রথার যে কিরূপ অপব্যবহার হইতে পারে ও তাহা যে আধুনিক যুগে ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির পরিপন্থী তাহা শুধু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখাইয়া দেন নাই, এদেশের মনিষীগণও যুবকবৃন্দকে বুঝাইয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। স্যর রাজেন্দ্র এই মনিষীগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনের পরবর্ত্তী সময়ে, স্বভাবসুলভ

স্পষ্ট ভাষায়, ভুক্তভোগীর শিক্ষা স্বরূপ, যুবক শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন ঃ—"বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার অপেক্ষা অন্য কোন গুরুতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। আমার বিবাহের সময় আমার বয়স সপ্তদশ এবং আমার স্ত্রীর বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল; আমার শিক্ষা-সমাপনের পূর্ব্বেই তিনি যৌবনবতী নারী হইয়া উঠিলেন। আমার ছয় বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল—আমার বাল্যবিবাহের সম্পূর্ণ কারণ এই যে আমি এক হিন্দু পরিবারে বিধবা মাতার একমাত্র পুত্র ছিলাম। আমার অভিভাবক অর্থাৎ পরিবারের কর্ত্তা, আমার স্বর্গীয় পিতার স্মৃতির প্রতি তাঁহার ভক্তি দেখাইবার উদ্দেশ্যে, এত অল্প বয়সে আমার বিবাহ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এক শিশুর সহিত আর এক শিশুর এই বিবাহ, পারিবারিক রীতি অনুসারে বিশেষ আড়ম্বরে ও সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। আমার স্ত্রী যাহাতে আমাকে চিঠি লিখিতে পারেন সেইজন্য আমি বাধ্য হইয়া আমার হাত খরচ হইতে প্রতিমাসে দুই চারি আনা বাঁচাইতাম; তিনি একদিন অন্তর আমাকে চিঠি লিখিতে চাহিতেন, কিন্তু আমার সেরূপ খরচ করিবার ক্ষমতা ছিল না। আমি মাসে পাঁচ টাকা করিয়া হাত খরচ পাইতাম—ইহা আমাকে বেলতলা হইতে প্রত্যহ কলেজে আসিবার জন্য সেয়ারের গাড়ী ভাড়া

ছাত্রজীবনে বিবাহের তীব্র নিন্দা।

হিসাবে দেওয়া হইত। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীর জন্য একদিন অন্তর চিঠি লিখিবার মত যথেষ্ট পোষ্টকার্ড কিনিতে পারিতাম না—বিবাহিতা যুবতীর অন্য যে সমস্ত ছোটখাট জিনিষের প্রয়োজন তাহা ত দূরের কথা। তাঁহার এই অভাব আমার পক্ষে এত কষ্টকর হইয়াছিল, এবং আমার মনের গভীর কোমল ভাব এরূপ ভাবে উত্তপ্ত ও বিকৃত করিয়া দিয়াছিল যে আমাকে স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইবে যে ইহাতে আমার শিক্ষার বিশেষ হানি হইয়াছিল। সেই জন্য, পূর্ণ দায়ীত্ব-জ্ঞান অনুসারে ও দৃঢ় বিশ্বাস ভরে, আমি আমার সমস্ত যুবক বন্ধুগণকে এই নির্ব্বন্ধই করি যে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিবার পূর্ব্বে তাহারা যেন কখনও বিবাহের বিষয় মনেও না করে—তা তাহাদের পিতামাতা যাহাই বলুন। আমি স্বীকার করিতেছি যে আমিও এই বিষয়ে দোষী, কেননা আমার পুত্রের শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহে আমাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। কিন্তু যখন আমার পুত্র শিক্ষার জন্য ভারতের বাহিরে গিয়াছিল, তখন তাহার স্ত্রীর হাত খরচের জন্য আমি কিছু দিতে পারিয়াছিলাম। আমি আমার স্ত্রীর ইচ্ছা ও বিশেষ পীড়াপীড়ির জন্যই, অনিচ্ছার সহিত এই বিবাহে মত দিয়াছিলাম। পাছে পুত্রটী এক ইংরাজ বালিকাকে বিবাহ করে এই ভয়ের ভাব আমার স্ত্রীর মনে ছিল বলিয়াই তাঁহার সানুনয় প্রার্থনা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। এরূপ

বিদেশী বিবাহ যে বাল্যবিবাহ অপেক্ষাও গুরুতর বিপদ এই ধারণা আমার থাকায়, আমি মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমার দ্বিতীয় পুত্রের সম্বন্ধে ইহা বলিতে পারি যে যতদিন সে শিক্ষা সমাপন করিয়া আশাপ্রদ কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করে নাই, ততদিন তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য কোন পীড়াপীড়িই করা হয় নাই।”

স্যর রাজেন্দ্রের জীবনের এক বিশেষ অংশের এই স্পষ্ট অথচ অর্থপূর্ণ বিবরণীর ভিতর, বাল্যবিবাহের তীব্র নিন্দা ব্যতীত, সেই অতীত যুগে তাঁহার মনে যে অশান্তি ও দুঃখকর দারিদ্র্যের ভাব বর্ত্তমান থাকিত তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহ তাঁহার পক্ষে কী গুরুতর প্রতিবন্ধক হইয়াছিল তাহাই তিনি পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়াছেন; আরও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে কোন ক্ষুদ্রতর মানবের পক্ষে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের উপর এরূপ বাধাগ্রস্থ জীবনের এতদূর দারুণ প্রতিক্রিয়া হয় যে তাহাতে তাহার উদ্দেশ্য-সাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু স্যর রাজেন্দ্র নিজে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছেন। কে বলিতে পারে যে যে ধাতুকে এরূপ কঠিন লৌহস্তম্ভের উপর পিটিয়া পিটিয়া উজ্জ্বল পিত্তল রূপে পরিণত করা হইয়াছে, তাহা এইরূপ আঘাত পাইয়াই আরও অধিকতর দীপ্তিমান্ হইয়া উঠে নাই? দুঃখের

অসাধারণ ক্ষেত্রে প্রতিকুল অবস্থার শুভ পরিণাম।

মধুরতা বিষয়ে নৈতিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; কিন্তু মানব সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীর একটি অল্প বিস্তর নির্দ্দিষ্ট ধারা এই মনে হয় যে কেবল ক্লেশ ও পরীক্ষার ভিতর দিয়াই মানুষ নিজের যথার্থ প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পারে।

নিজ ভরণ-পোষণ সম্বন্ধে স্বাধীনতা লাভ করিয়াও রাজেন্দ্র কঠোর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনাথাশ্রমে প্রত্যহ তুইঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তিনি কেবলমাত্র নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ অর্জ্জন করিতেন। তাঁহার পাঠ তখনও শেষ হয় নাই। সাধারণ চাকরীর উপর তাঁহার এতই বিতৃষ্ণা ছিল যে তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা নৈরাশ্যময় মুহূর্ত্তে, শত অভাব সত্ত্বেও, যে চাকরী তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন, সেরূপ কোন কাজ লইবার ইচ্ছা অতঃপর ভ্রমেও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। অপর দিকে, ইন্‌জিনিয়ারিং সমস্যার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ক্রমশঃ প্রবল আসক্তিতে পরিণত হইল। তাঁহার সমস্ত অবসর সময় ইন্‌জিনিয়ারিং বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধি এবং তাহার ক্রিয়াসিদ্ধ (Practical) প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইত। কলিকাতা সহরের রাস্তায় ও সাধারণ উদ্যানে তিনি প্রায়ই বেড়াইতেন, এবং সেই সময় প্রাসাদোপম অট্টালিকাবর্গের রচনা-কৌশল (design) দেখিয়া দেখিয়া, তিনি অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন।

নির্ম্মাণকার্য্য দর্শনে ঐকান্তিকতা।

ইন্‌জিনিয়ারিং মতামতে (theory) তিনি বিশেষ মোহিত হইতেন না; কিন্তু কারিকরগণ যখন তাহাদের ছোট ছোট কাজ তন্ময় হইয়া করিত, তখন তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়া তাহাদের কার্য্য দেখিতেন এবং সেই কাজগুলি আরও উত্তমরূপে করা যায় কিনা তাহাই ভাবিতেন। তিনি সহর্ষ মনোযোগ দিয়া স্থাপত্য-বিদ্যাবিদের অভিপ্রায়ের ক্রমবিকাশ একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেন, এবং কোথায় ও কি রূপে সেই কল্পনার উন্নতি সাধন করা যায় তাহাই নিজমনে তোলাপাড়া করিতেন। অন্য কোন সখে

উচ্চ গুণার্জ্জনের ভিত্তি।

তাঁহার মন নিবিষ্ট ছিল না—অন্য কোন খেলা তাঁহার অবসর সময়ের ভিতর আমল পাইত না। তাঁহার সময়, তাঁহার মন, তাঁহার কর্ম্মশক্তি সমস্তই এক সর্ব্ব-প্রধান উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত থাকিত। যে প্রখর ও কেন্দ্রীভূত শ্রমশীলতা ও নৈপুণ্য, রাজেন্দ্রনাথ নিজ কর্ম্মজীবনের প্রথম আরম্ভ হইতেই দেখাইতে পারিয়াছিলেন, আমাদের বিশ্বাস তাহার ভিত্তি এই রূপেই স্থাপিত হইয়াছিল।

তুচ্ছ ঘটনা হইতে কিরূপে বৃহৎ ব্যাপার উৎপন্ন হয়, স্যর রাজেন্দ্র তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের সময়বিশেষে আপনাকে, ও যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিবার সুযোগ পান তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবার সূত্র পাইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি যে প্রসিদ্ধ ও উচ্চ স্থান অধিকার

করিয়া আছেন, একটী সামান্য ঘটনা তাঁহাকে তদুদ্দিষ্ট পথে চালিত করিয়াছিল—উপরোক্ত সত্যের ইহা অপেক্ষা উত্তম উদাহরণ তাঁহার জীবন হইতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি এই সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধু মতিলালের সঙ্গে এক মেসে থাকিতেন। মতিলাল যে ডাক্তারী পেশার জন্য আপনাকে শিক্ষিত করিতেছিলেন, তাহার আশায় থাকিতেন। কিন্তু স্বাধীন ব্যবসায়ী-জীবনের এক ছায়ামাত্র ছাড়া, রাজেন্দ্রের সম্মুখে অন্য কোন বিশেষ লক্ষ্যই ছিল না। এমন কোন বিশদ ও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী জানা ছিল না, যাহা অনুসরণ করিয়া তিনি জীবনের উচ্চাকাঙ্খার স্রোতস্বতী পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারেন। বলিতে কি, তিনি যেন এক অজ্ঞাত বাধায় লাগিয়া ক্রমাগত হোঁচট খাইতে ছিলেন, এবং সেই বাধার অপর দিকে তাঁহার উচ্চাভিলাষ ও স্বপ্নের আসল আকৃতি বিরাজিত ছিল।

তুচ্ছ ঘটনায় উচ্চাকাঙ্খার সফলতা।

বাঙ্গালীর মনে, 'ব্যবসায়' শব্দটী কোন আকর্ষণী ও মোহিনী শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না। ব্যবসায়-গত শিক্ষানবিশী করিতে হইলে, যে কঠিন পরিশ্রম ও শ্রমশীলতার প্রয়োজন, তাহার বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর ধ্যানপরায়ণ মানসিক জড়তা, শারীরিক অবসন্নতার সহিত মিলিত হইয়া, বিশেষ

ব্যবসায়ী-জীবনে বাঙ্গালীর অযোগ্যতা।

বাধার সৃষ্টি করে। বাঙ্গালী কবিসম্রাট্, বিরাট্ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য্য-বোধের দিক্ হইতে, এই মনোবৃত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কঠোর সত্য এই যে কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানবিষয়ক নির্লিপ্ততা কখনই মানুষের অন্নসংস্থান করিতে পারে না। সততাযুক্ত কর্ম্মের মূল্য ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ পরিশ্রমের মর্য্যাদা-জ্ঞান রাজেন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পরিবারে এমন কোন পূর্ব্বরীতি (tradition) ছিল না, যাহা তাঁহার মনে ব্যবসায়-গত কর্ম্মজীবনের দিকে অনিবার্য্য প্রেরণা আনিতে পারিত। তাঁহার চারিপার্শ্বে ও নিকটে এমন কোন জীবন্ত উদাহরণও ছিল না যাহা তাঁহাকে, যেন হাতছানি দিয়া, ঝটিকাময় ও বিষম প্রয়াসপূর্ণ জীবনের দিকে আহ্বান করিতে পারিত। কিন্তু তাঁহার মন ছিল অগ্রণীর মত—তাহা সাহস ও নৈপুণ্য-সহকারে সুগঠিত এবং যুক্তিমূলক সুনিশ্চিত প্রণালী অনুসারে সুরচিত। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও মনোবল, যৌবনসুলভ আশাবত্তার সহিত মিলিত হইয়া, এমন একটী অভূতপূর্ব্ব কর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিল, যাহা তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসীগণের নয়নপথে উজ্জ্বলপদচিহ্নস্বরূপ পড়িয়া রহিয়াছে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সহিষ্ণু পরিশ্রম ও সাহসে সফলতা।

প্রায় একবৎসর রাজেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের সাময়িক শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ

ইন্‌জিনিয়ারিং সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধিই তাঁহার প্রধান বৃত্তি ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অট্টালিকা প্রভৃতির আসল নির্ম্মাণকার্য্য তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সেই সময়, রামব্রহ্ম সান্যাল নামক একটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র তাঁহার সঙ্গে এক মেসে থাকিতেন। অবিরত অসুস্থতা, সান্যালের ছাত্রজীবনের সাথী হইয়া ছিল; তাহার ফল এই হইল যে তিনি ডিগ্রি পাইলেন না, সুতরাং পড়া বন্ধ করিয়া অর্থকর কার্য্যের চেষ্টা করা ভিন্ন তাঁহার অন্য উপায় রহিল না। তিনি জীবনবিজ্ঞানের (biology) ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন বলিয়া আলিপুরের চিড়িয়াখানার সুপারিণ্টেডেণ্টের পদ পাইলেন। তখন সবেমাত্র সেই চিড়িয়াখানা মঞ্জুর হইয়াছিল, এবং তাহার অন্তর্গত বাগান প্রস্তুত হইতেছিল।

প্রথম সুযোগে সান্যালের সম্বন্ধ।

সান্যাল ও রাজেন্দ্র এক মেসে থাকিয়া দুই নিকট বন্ধু হইয়া গিয়াছিলেন। সান্যাল সুপারিণ্টেডেণ্টের কার্য্যে যোগ দিবার পর, রাজেন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে আলীপুরে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং তাঁহার সঙ্গে নব-বিন্যস্ত বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তখন সেখানে পশুপক্ষীদিগের বাসের জন্য পিঞ্জর ও গৃহসমূহ গঠিত হইতেছিল। এক সুন্দর প্রভাতে, রাজেন্দ্রের স্কুলে পড়াইবার কার্য্য

উন্নতি-মূলে তুচ্ছ ঘটনার বিবরণ।

না থাকায়, এইরূপ বন্ধু-দর্শনের জন্য তিনি আলীপুরে গিয়াছিলেন এবং সান্যাল ও তিনি গল্প করিতে করিতে বাগানে বেড়াইতেছিলেন। গল্পের বিষয় বোধ হয় তাঁহাদের পুরোবর্ত্তী নিজ নিজ আদর্শ ও আকাঙ্খা, কিম্বা হয়ত তাঁহাদের মেসের জীবনের তুচ্ছ ঘটনা এবং মেসের বন্ধুগণ। হঠাৎ রাজেন্দ্রনাথের মনোযোগ কতকগুলি লোকের দিকে আকৃষ্ট হইল। সেইদলে একজন ইংরাজ ছিলেন, এবং তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কারীকরদিগকে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝাইতে গিয়া স্পষ্টতঃই ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। সেই স্থানে, বিশেষ নক্‌সা অনুযায়ী ও নূতন আকৃতির একটি সেতু নির্ম্মিত হইতেছিল, এবং সেই ইংরাজ, সম্ভবতঃ ভারপ্রাপ্ত ইন্‌জিনিয়ার, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হিন্দুস্থানী-মিশ্রিত বাংলায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে সেতুর মূল দেওয়াল (abutment) ঠিক খিলান তুলিবার পুর্ব্বেই কিভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। রাজেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটী বুঝিতে পারিলেন। যে মিস্ত্রি, সম্মানভরে কিন্তু স্পষ্টতঃই নিষ্ফল ভাবে, ইন্‌জিনিয়ারের অস্পষ্ট আদেশ শুনিতেছিল, তাহারই সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথের, পূর্ব্বে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং এই দুই জনের কথাবার্ত্তার মাঝে পড়িয়া, ইংরাজ কি বলিতে চাহেন তাহা দেশীয়ভাষায় বুঝাইয়া দিবার একটা ঝোঁক

হঠাৎ তাঁহার মনে আসিল। মুহূর্ত্তের উত্তেজনাবশে তিনি মিস্ত্রিকে ডাকিয়া, কিরূপে সেই প্রধান দেওয়াল নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহা তাঁহার পরিস্কার ও সুনিশ্চিত ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। মিস্ত্রি অবিলম্বে বিষয়টী বুঝিতে পারিল, এবং পূর্ব্বমুহূর্ত্তের উদ্বেগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, স্বাভাবিক আনন্দভরে ইন্‌জিনিয়ারকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে আর তাঁহার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ এখন সে কি করিতে হইবে ও কিরূপে করিতে হইবে তাহা ঠিক বুঝিয়াছে।

এই ইংরাজ ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লি—তখন তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ ইন্‌জিনিয়ার ছিলেন। পরে তিনি নাইট্ উপাধি লাভ করেন, এবং হুগলি-পুলের প্রসিদ্ধ পরিকল্পনাকারীরূপে ইন্‌জিনিয়ারিং জগতে পরিচিত হন। ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লি, এই কথাবার্ত্তায় বাধাপ্রদানে কিছু মনে করেন নাই। তিনি রাজেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কে ও বাগানে কি করিতেছেন। রাজেন্দ্রনাথ যে কৈফিয়ত দিলেন তাহা তাঁহার প্রকৃতির পরিচায়ক। ইন্‌জিনিয়ারিং পেশার সুপরিচিত ও সর্ব্ব-স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ এই ইংরাজের সঙ্গে তাঁহার পক্ষে সরলভাবে কথা বলিবার কোন বাধা ছিলনা, বিশেষ প্রায় অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে হইতেছিল যে ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, ও তাঁহাকে সাহায্য করিতে

অভিলাষী হইয়া, সদয়ভাবে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। রাজেন্দ্র প্রথমে সান্যালের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুতার বিষয় উল্লেখ করিলেন, আর বলিলেন যে দু'জনেই অসুস্থতা বশতঃ নিজ নিজ পেশার উপযুক্ত হইবার ডিগ্রি না পাইয়া, দুর্ভাগ্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং এখন সান্যাল অর্থকর ও ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মজীবন নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হওয়ায়, তিনি সময়ে সময়ে বন্ধুর নিকটে একটু গল্প করিতে ও পরামর্শ লইতে আসায় আনন্দ লাভ করেন। ইহাই তাঁহার আলিপুরের বাগানে আসিবার কারণ। আরও জিজ্ঞাসিত হইয়া, তিনি নিজ উচ্চাকাঙ্খার ইতিহাস বর্ণনা করিলেন—কিরূপে ইন্‌জিনিয়ারিং পেশা ও স্বাধীন জীবনের জন্য প্রবল আসক্তি ও উৎসাহ বশতঃ, তিনি একটি মোটা বেতনের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি, স্থপতি ও কণ্ট্রাক্টর রূপে যে স্বাধীন জীবিকা আবিষ্কার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাই জোর করিয়া বলিলেন। তাঁহার ইন্‌জিনিয়ারিং-বিষয়ক জ্ঞান যে কোন ক্রমেই সামান্য ছিলনা, তাহা তিনি যে ভাবে মিস্ত্রির দ্বারা কাজ চালাইয়া লইয়া-ছিলেন তাহা হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল; এবং এই কৈফিয়ত হইতে ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লি, তাঁহার সম্মুখস্থ যুবকের ক্ষমতা বিষয়ে যে অনুকূল ধারণা করিয়াছিলেন তাহাও নিঃসন্দেহ। যদিও এক উচ্চাভিলাষী কিন্তু প্রায়

নিঃসম্বল যুবকের বিরাট্ কল্পনায় ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লির হাস্যের উদ্রেক হইয়াছিল, তথাপি তিনি রাজেন্দ্রকে নিজ কার্ড দিয়া পরদিন প্রাতে পল্‌তা জলকলের কারখানায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিলেন।

অদৃষ্টচক্রের বিবর্ত্তন ও ভাবপ্রবণ কৃতজ্ঞতা।

যে সামান্য ঘটনাসূত্রে তাঁহার সৌভাগ্যের দ্বার খুলিয়া গেল, কী আনন্দভরে স্যর রাজেন্দ্র তাহার দিকে পশ্চাৎ দৃষ্টি করেন, তাহা সম্পূর্ণভাবেই বুঝা যায়। পঞ্চাশোর্দ্ধ বৎসর পরে, যখন বৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ স্যর ব্রাড্‌ফোর্ড, স্যর রাজেন্দ্রের বিলাতে আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, হঠাৎ তাঁহার লণ্ডনস্থ অফিসে প্রবেশ-পূর্ব্বক, দুষ্ট বালকের প্রতি শিক্ষকের ব্যবহারের মত, তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি তাড়না করিলেন, তখন কী রহস্যময় স্মৃতির প্রভাবে স্যর রাজেন্দ্রের সমস্ত ভাবপ্রবণ হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল, তাহা অনুমানের যোগ্য। যখন স্যর রাজেন্দ্র এক বিশেষজ্ঞ কমিটির (স্যর আর, এন, মুখার্জ্জির নেতৃত্বে ইন্‌জিনিয়ারিং কমিটি নামে পরিচিত কমিটির) পরামর্শানুসারে কলিকাতার জন্য ক্যান্‌টি-লেভার পুলের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই কয়েক মাস পরে এই সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। ভাগীরথীর যে বর্ত্তমান ভাসমান সেতু অর্দ্ধশতাব্দীর উপর জনসাধারণের উপকার করিয়া আসিয়াছে, স্যর ব্রাড্‌ফোর্ড তাহার পরি-কল্পনাকারী। তখন তিনি যেমন শ্রমশীল ও পৌরুষের

আধার ছিলেন, উপরোক্ত ঘটনার সময় প্রায় নবতীবর্ষ বয়সের বৃদ্ধ হইয়াও তদ্রূপ ছিলেন। অদৃষ্টের বিবর্ত্তনে, তিনি, কলিকাতায় ভাগীরথী পার হইবার জন্য ভাসমান ধরণের আর একটি পুলের সমর্থনকারীরূপে, মুখার্জ্জি কমিটির সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই প্রস্তাব, সেতু-নির্ম্মাণ-স্থাপত্যের বর্ত্তমান অর্থ-বিজ্ঞান অনুসারে স্পষ্টভাবেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কমিটির পরিকল্পনার পক্ষে যে উৎকৃষ্ট শিল্পবিষয়ক যুক্তি ছিল তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াও, স্যর ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লি স্যর রাজেন্দ্রকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন যে তিনি যেন তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্নিহিত মত একেবারে বর্জ্জন করিয়া একজন সমকর্ম্মী ইন্‌জিনিয়ার ও পুরাতন বন্ধুর সুনাম নষ্ট না করেন। ইহা বিশুদ্ধ ভাবপ্রবণতার উদ্দেশে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। স্যর রাজেন্দ্র বলিয়াছেন যে এই অনুরোধে তাঁহার গভীর মনোভাব সাড়া দিবার মত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই কমিটি তাঁহাদের বিবরণী প্রদান করায়, তখন তাঁহার এ বিষয়ে আর কিছু বলিবার ছিল না। সুতরাং, যুক্তি ও শিল্পসঙ্গত উৎকর্ষ বিসর্জ্জন দিয়া, ভাবপ্রবণতা অনুসারে কার্য্য করিবার যে প্রথম ঝোঁক তাঁহার হইয়াছিল, তাহা দমন করা ভিন্ন উপায় ছিল না। এই সাক্ষাতে স্যর রাজেন্দ্রের চরিত্রের এক হৃদয়গ্রাহী বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি কখন উপকার বা মহৎ কার্য্যের কথা ভুলেন না।

যখন স্যর ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লি আপোষের জন্য দৃঢ়ভাবে যুক্তি দেখাইতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকট বাধিত থাকার ভাব স্যর রাজেন্দ্রের মনে জাগরূক ছিল, এবং এই ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা স্যর ব্রাড্‌ফোর্ডের যুক্তির সম্বন্ধে প্রায় তাঁহার মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়াছিল। কিন্তু তিনি আরও একটি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যখন শিল্পসংক্রান্ত কার্য্যকারিতা বিচারের বিষয়, তখন কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত অনু-সারে কার্য্য হওয়া উচিত। এই হিসাবে, তিনি কোন মতের একমাত্র সমর্থনকারী হইলেও, কঠিন প্রস্তরের মত দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন। এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ, জনসাধারণের জন্য তাঁহার কৃত বিবিধ কার্য্যাবলীর ভিতর বার বার পাওয়া গিয়াছে।

সমূহ আপত্তিসত্ত্বেও নিজ মতের পোষকতা।

ঘটনার সূত্র ধরিয়া বলা যায় যে আলিপুরে ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লির সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর, সমস্ত দিন রাজেন্দ্রনাথ শত আশা ও উত্তেজনার মধ্যে কাটাইয়া দিলেন। দুইটি সমস্যা আপাততঃ তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল—অর্থাৎ অর্থ বা মূলধন ও পরিচ্ছদ বিষয়ক সমস্যা। প্রথমটীর সমাধান অদূর ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিয়া, তিনি পরিচ্ছদ সম্বন্ধে, পরদিন প্রভাতে তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইহা যে কী গুরুতর সমস্যা তাহা বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে যে বঙ্গের তদানীন্তন

অবস্থায় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে, বিশেষ ইন্‌জিনিয়ারিং ব্যবসায়ে, বিশুদ্ধ বাঙ্গালী উদ্যম হতাদরে পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ অধীন জাতির আত্ম-সৃষ্ট হীনতা-মনোভাব (inferiority complex) বর্ত্তমান থাকায়, শাসকজাতির পরিচ্ছদ অনুকরণ সম্মানসূচক বলিয়া গণ্য হইত। তখন বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে, সরকারী পদ ও সরকারী কার্য্যভার প্রদান করিবার সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের, ভারতবাসী সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি ও কর্কশ মেজাজ ছিল। এইরূপ প্রকৃতির লোক কখন ধারণাই করিতে পারিতেন না যে অধীন জাতির কোন মস্তিষ্ক-শক্তি বা অনুভব-ক্ষমতা থাকিতে পারে। সুতরাং বিজিত জাতির লোকের পক্ষে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সামান্য কৃতকার্য্যতার উপায়, সাধারণতঃ অনুকরণের পথে পাওয়া যাইত। বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ইংরাজী শিক্ষায় সজাগ হইয়া, এই অবস্থার মূলসূত্রগুলি আয়ত্ত করিয়া লইল, এবং জয়ী হইবার জন্য নত হইল ("stooped to conquer")।

ইন্‌জিনিয়ারিং ব্যবসায়ে পরিচ্ছদ-সমস্যা।

রাজেন্দ্রনাথ অনেক ভাবিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে উপহাস বা তাচ্ছিল্য এড়াইবার জন্য, গলাবন্ধ কোট ও পেণ্টুলন পরিধান করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। বর্দ্ধনশীল মানসিক শক্তি থাকায়, তিনি স্থানকালের উপযোগী অনুষ্ঠান সহজেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন। বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য,

ধুতি-কামিজ ছাড়িয়া ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিধানে তাঁহার মনে কোন চাঞ্চল্যের উদয় হয় নাই; তথাপি তিনি যে একটা নূতন কার্য্য করিতেছেন, এই চিন্তা তাঁহার মনে দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। স্যর রাজেন্দ্রের এই মত যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক ব্যবসায়-কার্য্যে বিশেষ ফলদায়ক, কেননা ইহাতে স্বচ্ছ মন ও চতুর মস্তিষ্কের আভাস পাওয়া যায়। সাফল্য লাভ করিতে হইলে শ্রমশীলতা ও নৈপুণ্যের আভাস, ইহার সহিত যুক্ত হওয়া উচিত।

উপরোক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, আলিপুর বাগানের ঘটনার পরদিন প্রাতে রাজেন্দ্রনাথ যখন পল্‌তা জলকলের কারখানায় গিয়া ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাঁহার বাহিরের আকারে বুদ্ধিমত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও আত্মবিশ্বাসের ভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁহার শুভ্র নূতন বেশ দেখিয়া, ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লির মুখে বিদ্যুতের মত একটু হাঁসি খেলা করিয়া গেল। তখন পল্‌তা কারখানায় শোধন-ক্ষেত্রের বিস্তৃতি, থিতাইবার পুষ্করিণী খনন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে সমস্ত কার্য্য, লেস্‌লির সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইতেছিল, তাহা তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া রাজেন্দ্রনাথকে দেখাইলেন, ও তদ্বিষয়ক অনেক কূট প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া, হঠাৎ

কার্য্যে উপযোগিতার প্রথম পরীক্ষা।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন করিলেন, অর্থাৎ তখন যে যে হারে বিভিন্ন কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইতেছে, ঠিক সেই সেই হারে রাজেন্দ্রনাথ কার্য্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কিনা। ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লি কোন হিসাব, কোন হার বা কোন কার্য্যের পরিমাণ দেখাইলেন না—কেবলমাত্র অবিলম্বে "হাঁ" কি "না" এই উত্তর চাহিলেন। "হাঁ" বলিলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা এবং "না" বলিলে এত বড় সুবিধা-ত্যাগ—এই দুইটী বিরুদ্ধ চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য যুগপৎ রাজেন্দ্রনাথের মনে উদিত হইল, কিন্তু স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতি, এবং, যদি আর কেহ (তাঁহার পক্ষে অজ্ঞাত) নির্দ্দিষ্ট হারে কাজ চালাইতে পারে তবে তিনিও পারিবেন—এই আত্মবিশ্বাসবশতঃ তিনি বিনা করারে নির্দ্দিষ্ট হার স্বীকার করিয়া লইলেন; কিন্তু ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লিকে বলিলেন যে নিয়ম-সাপেক্ষ না হইয়া তিনি যে এই সম্মতি দান করিলেন তাহার অপরার্থ এই যে তিনি সমস্ত কাজ পাইবেন। কথায় কথায় একেবারে এই বিষয়টীতে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায়, লেস্‌লি বিষম সংশয়ে পড়িলেন, কিন্তু ইন্‌জিনিয়ার হিসাবে তাঁহার ধারণা হইল যে আশু উত্তরের দাবী করা তাঁহার পক্ষেও ঠিক সঙ্গত হয় নাই। অধিকন্তু রাজেন্দ্রনাথের কথার সুরে তাঁহার আত্ম-প্রত্যয়ের পরিচয় পাইয়া, তিনি যে অজ্ঞাত ক্ষতিপূরণ হিসাবে সমস্ত কাজটী চাহিতেছেন, সে প্রার্থনা লেস্‌লি ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

আলিপুর বাগানে সাক্ষাতে নিশ্চয়ই ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লির মনে রাজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনুকূল ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল, কেননা তিনি তাঁহার হস্তে সমস্ত কার্য্য সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষে ব্যক্তিগত আকর্ষণ শক্তিরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যুবাবয়স হইতেই যে রাজেন্দ্রনাথ এই অনির্ণেয় ক্ষমতার অধিকারী তাহা নিঃসন্দেহ। যাঁহারাই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে তাঁহারা এক নেতৃজাতীয় ব্যক্তির সম্মুখে সমাসীন, এবং তদ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ ইচ্ছাশক্তির উপর একপ্রকার অবর্ণনীয় প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। একবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইবার পর, যথাসময়ে বিরুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি স্যর রাজেন্দ্রের নিজ ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে—এরূপ ঘটনা যে কত বার ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ব্যাখ্যার অতীত এবং অতীব বাঞ্ছনীয় এই আকর্ষণশক্তির সহিত, উচ্চশ্রেণীর যুক্তি-প্রদর্শন-শক্তি, শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতার উপাদান যোগ করিলে, আমরা ব্যবসায়-কর্ম্মী হিসাবে স্যর রাজেন্দ্রের অপূর্ব্ব সফলতার রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইব।

ব্যক্তিগত আকর্ষণশক্তি।

পল্‌তা জলকলে নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়াই রাজেন্দ্রনাথ এক কঠিন পরীক্ষায় পড়িলেন। ফেন্‌উইক নামক যে ইংরাজ এই কার্য্যের স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন,

তাঁহার কার্য্যে অভিজ্ঞতা থাকিলেও, দুর্দ্দান্ত স্বভাব ও উষ্ণ মেজাজ ছিল। ভারতীয় কর্ম্মচারী ও কণ্ট্রাক্টরগণের সহিত তিনি সাধারণতঃ সদ্ব্যবহার করিতেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররূপে এই জলকল পরিদর্শন করিতে আসিয়া, রাজেন্দ্রনাথ ফেন্‌উইকের ভারতীয়-বিদ্বেষী মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। সুতরাং যখন ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লি ফেন্‌উইকের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন যে অতঃপর এই কর্ম্মচারীর অধীনে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে, তখন প্রথম ইংরাজের সহিত—এবং এই জাতীয় ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কার্য্য করিতে হইবে ভাবিয়া রাজেন্দ্রনাথ চিন্তাকুল ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। কিন্তু তাঁহার অদম্য উচ্চাভিলাষ থাকায় ভয়ের ভাব কাটিয়া গেল—তিনি সাহসভরে প্রকৃত বিপদের সম্মুখীন হইলেন। উপস্থিত ঘটনাবলী অবিলম্বে বুঝিয়া, তদুপযোগী আশু আচরণ স্থির রাজেন্দ্রের মনোবৃত্তির অঙ্গ বিশেষ।

ভারতীয়-বিদ্বেষী ইংরাজের সংসর্গে কার্য্যের কঠোরতা।

ফেন্‌উইকের সহিত সদ্ভাবে চলিতে হইলে যে প্রচুর পরিশ্রম ও কূটবুদ্ধির প্রয়োজন তাহা উপলব্ধি করিয়া, রাজেন্দ্রনাথ ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লির নিকট কার্য্যক্ষেত্রে বাসস্থানের প্রার্থনা করিলেন, কেননা তাহা পাইলে তিনি দিবারাত্রি কার্য্যের নিকট

কার্য্যক্ষেত্রে বাসস্থান সংগ্রহ।

থাকিয়া কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিতে পারিবেন। লেস্‌লি তাঁহার জ্বলন্ত আগ্রহ ও দৃঢ়বিশ্বাস লক্ষ্য করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ফেন্‌উইকের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী বাংলোর অর্দ্ধাংশ রাজেন্দ্র-নাথকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। অপরার্দ্ধে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন—প্রকাশ্যে এই কারণে, ফেন্‌উইক নিয়ম করিয়া দিলেন যে রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার অংশটি পরিষ্কার ও উপযুক্ত ভাবে সাজাইয়া পাশ্চাত্যপ্রথায় সে স্থানে বাস করিবেন, কেননা এরূপ না করিলে প্রতিবাসী ইংরাজের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের সম্ভাবনা। কিন্তু ফেন্‌উইকের গূঢ় উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ অন্যরূপ ছিল—অর্থাৎ বড় সাহেবের অনুগ্রহভাজন এই বাঙ্গালী, বিদেশীভাবে বাস করিতে বাধ্য হইলে, ব্যক্তিগত আচার ব্যবহারে শীঘ্রই অপদস্থ হইয়া পড়িবে। রাজেন্দ্রনাথ এতদূর অগ্রসর হইয়া, ফিরিবার চিন্তা মনেও স্থান না দিয়া, সহাস্যমুখে ফেন্‌উইকের নিয়ম স্বীকার করিয়া লইলেন।

অতঃপর সর্ব্বপ্রধান সমস্যা অর্থাৎ অর্থ-সমস্যা সমাধানের সময় আসিয়া পড়িল। রাজেন্দ্রনাথ প্রথম কণ্ট্রাক্ট পাইলেন —তাঁহার উচ্চাভিলাষ, আত্মবিশ্বাস ও যৌবনসুলভ আশাবত্তার মণিকাঞ্চন-সংযোগে; সেই কার্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সফলতার প্রথম সোপানে আরোহন করিলেন—তাঁহার চতুর বিষয়-বুদ্ধি প্রভাবে; এবং কার্য্যস্থলে বাসস্থান

সংগ্রহ করিলেন—নিখুঁতভাবে কার্য্যসম্পাদনের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রদর্শন সূত্রে। কিন্তু এতগুণ সত্ত্বেও, মূলধন না থাকিলে কোন কণ্ট্রাক্ট কার্য্যই আরম্ভ করা যায় না, কেননা সম্পাদিত আংশিক কার্য্যের জন্য প্রাপ্য টাকা পাইবার বহু পূর্ব্বে শ্রমিকদিগের বেতন নিয়মিত ভাবে সময়ে সময়ে দিতেই হইবে। সুতরাং রাজেন্দ্রনাথ, নিকট বন্ধু ও সঙ্গীগণের সাহায্যে, অর্থের অন্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হইলেন। প্রথমে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। দিনের পর দিন যখন সন্ধ্যার সময় হতাশ ও অবসন্নভাবে তিনি মেসে ফিরিয়া আসিতেন, তখন মেসের বন্ধুবর্গের উৎসাহসূচক বাক্য ও পরামর্শ তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিল। কণ্ট্রাক্ট কার্য্যের জন্য করপোরেশনের অঙ্গীকারপত্র হাতে পাইয়াও, একজন অপরিচিত মুরুব্বীহীন বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ, কার্য্যতঃ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইল। অবশেষে দৈব রাজেন্দ্রনাথের প্রতি সুপ্রসন্ন হইল। দেবেন্দ্রনাথ সেন নামক তাঁহার মেসের এক বন্ধু (তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র) কোনক্রমে ১,০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া, আধা-আধি লভ্যাংশে সেই টাকা রাজেন্দ্রনাথকে ধার দিলেন। তাঁহার নূতন আবাসস্থান, অর্থাৎ স্নানাগার-সংযুক্ত শয়ন-কক্ষ, বসিবার ঘর ও বারাণ্ডার একাংশ সাজাইতেই এই টাকার অর্দ্ধেক ব্যয় হইয়া গেল। ইহা যে

বহুকষ্টে মূলধন সংগ্রহ ও বাসস্থান সজ্জিতকরণ।

কত বড় পরিবর্ত্তন তাহা বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে, যে, তখনও পর্য্যন্ত রাজেন্দ্রনাথ, সাধারণ বাঙ্গালী যুবকশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত প্রথায় বাস করিতেন, অর্থাৎ তাঁহার আসবাবের মধ্যে কেবল মাত্র একখানি তক্তাপোষ ও তদুপযুক্ত বিছানা এবং দুই স্যুট পরিধেয় বস্ত্রপূর্ণ একটী টিনের বাক্স ছিল। অতীত যুগের ছাত্রদিগের ব্রহ্মচর্য্য এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার সহিত উন্নতভাব-ধারার সংযোগের বিষয় স্মরণ করিয়া, অধিকন্তু দারিদ্র্যের পীড়নে, সে যুগের ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ অত্যল্প ব্যয়ে জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। রাজেন্দ্রনাথ যতদিন কলিকাতায় মেসে ছিলেন এই ভাবেই থাকিতেন। এখন তাঁহার প্রথম কর্ম্মদাতা-দিগের নির্ব্বন্ধে জীবনযাত্রায় অকস্মাৎ আড়ম্বর দেখাইতে বাধ্য হইয়াও, তিনি মিতব্যয়িতার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলেন না। বিলাতী প্রথায় সজ্জিত দুই একটী বাটিতে যাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তদনুসারে তিনি গৃহসজ্জার অত্যাবশ্যক উপকরণগুলি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন—অর্থাৎ মূল্যবান্ কার্পেটের পরিবর্ত্তে সৌখীন মাদুরের আচ্ছাদন, একখানি ক্যান্‌ভাসের খাট, ছয়খানি চেয়ার, একটী খাইবার টেবিল, একটী আলমারী, বস্ত্রপরিবর্ত্তনের ঘরের জন্য একটী কাপড়ের আল্‌না, ও শুভ-সূচনা হিসাবে শেষোক্ত ঘরে এক বৃহৎ দর্পণ। এই সমস্ত সৌভাগ্যসূচক সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া রাজেন্দ্রনাথ মনে

মনে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মূলধনের অর্দ্ধেক অন্তর্হিত হইল। তথাপি সেই অবস্থায় ইহা যে অর্থের সদ্ব্যবহার, এ বিষয়ে তাঁহার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। গৃহ প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি ফেন্‌উইককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি গৃহের সাজসজ্জা প্রভৃতি দেখিতে অভিলাষী কি না। ফেন্‌উইক তাঁহার নির্দ্দেশবাণী স্মরণ করিয়া, গৃহসজ্জা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার মনোগত ভাব এই ছিল যে তাঁহার রাজ্যে বিসদৃশ প্রজাস্বরূপ এই নূতন কণ্ট্রাক্টর প্রথম পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে গৃহসজ্জা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং তাহা ছাড়া প্রধান ঘরগুলির বস্ত্রাচ্ছাদন প্রভৃতি এরূপ বিশুদ্ধ ইউরোপীয় প্রথায় সুবিন্যস্ত, যে কোন বাঙ্গালীর ঘরে সেরূপ দেখা যায় না। তিনি আশ্চর্য্য ও সন্তুষ্ট হইয়া, রাজেন্দ্রের নিকট স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, অধিকন্তু বলিলেন যে তাঁহার আশা আছে যে রাজেন্দ্রনাথ কঠিন পরিশ্রম করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না—ক্রমশঃ ইংরাজ সহকারীদিগের মত বসবাস করিতে শিক্ষা করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ

কণ্ট্রাক্টররূপে নবজীবনে প্রবেশ করিয়াই, রাজেন্দ্রনাথ অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পলতার বাংলোতে থাকিবার সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে এক সপ্তাহ কাল, তিনি প্রত্যহ প্রাতে সেয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ছয়টার ট্রেণ ধরিয়া কার্য্যে যাইতেন, এবং সন্ধ্যা সাতটার সময় কলিকাতায় মেসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন—সমস্ত সময় পর্য্যবেক্ষণ, তদারক ও উপস্থিত কার্য্যের খুটিনাটি আয়ত্ত করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। একজন বাঙ্গালী যুবক যে সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া কার্য্যে এতদূর বিভোর হইয়া থাকিতে পারে, তাহা ফেন্‌উইকের মত ইংরাজদিগের নিকট অভিনব দৃশ্য বলিয়া গণ্য হইত। রাজেন্দ্রনাথ অল্পাহারেই তৃপ্ত হইতেন—তাঁহার বিপুল শ্রমশীলতা ও উৎসাহ নিজ আশু প্রয়োজনেরই অনুরূপ ছিল। ফেন্‌উইকের নিকট হইতে গৃহসজ্জার অনুমোদন লাভে তাঁহার উৎসাহ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; এবং গৃহ প্রবেশের পর তিনি আরও অধিক সময় ও মনোযোগ হাতের কাজে দিতে লাগিলেন। তাঁহার

কার্য্যে ঐকান্তিকতা; অল্প মূলধনের সম্ভাবিত শুভফল।

ঋণ-লব্ধ মূলধনের মধ্যে ৫০০৲ টাকা মাত্র অবশিষ্ট ছিল, অতএব তাঁহার পক্ষে পরিদর্শক ইন্‌জিনিয়ারদিগের মনে নিজ কর্ম্ম-ক্ষমতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল, কেননা একমাত্র এই উপায়েই তিনি তাঁহার বিলের টাকা শীঘ্র পরিশোধ ও স্বল্প মূলধন পূরণ করাইতে পারিতেন।

ব্যবসায়-ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজনীয়তা ও শক্তির পরিমান অনেক সময় অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে। অর্থ যতক্ষণ অর্থরূপেই থাকে—যতক্ষণ তাহা কার্য্যে সুপ্রযুক্ত হইয়া উৎপাদন ও অর্থবৃদ্ধির সহায়তা না করে, ততক্ষণ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অর্থের বাস্তব সত্তা পরিলক্ষিত হয় না। কোন উৎসাহী ও উদ্যমশীল যুবক যখন উৎপাদন-কার্য্য সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে, তখন তাহার পক্ষে অর্থ-শক্তির অভাব বিরক্তি ও বাধার কারণ হয় বটে, তথাপি এই অর্থঘটিত বিঘ্নবশতঃই তাহার কৃত কার্য্য প্রকারান্তরে আপেক্ষিক উৎকর্ষ লাভ করে কিনা, তাহা গবেষণার বিষয়। এই আলোচনায় দারিদ্র্যের প্রশংসাসূচক কিছুই নাই—অপর দিকে অর্থের অসচ্ছলতাবশতঃ, ব্যবসায়ে যে সমস্ত অসুবিধা ঘটে বলিয়া জনসাধারণের ধারণা তাহারও যে অঙ্কশাস্ত্রসম্মত সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, এ মতও ভ্রান্ত নয়। অধিকন্তু, জ্ঞানীগণ স্বীকার করেন যে অর্থের প্রাচুর্য্যঘটিত সুবিধাও সীমাবিশিষ্ট। সামান্যভাবে জীবন

যাপনে অভ্যস্ত রাজেন্দ্রনাথ যে পেশা গ্রহণ করিয়াছিলেন, নগদ টাকার অভাবে তাহার উন্নতি সময়ে সময়ে এরূপভাবে স্থগিত থাকিত যে তাহাতে তিনি প্রায় উন্মত্ত ও মরিয়া হইয়া উঠিতেন, কিন্তু তাঁহার এমনই চরিত্র-বল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল যে প্রয়োজনের সময় তিনি অর্থকষ্টের বিষয় ভুলিয়া গিয়া হাতের কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারিতেন। অর্থ-সমস্যা উদ্বেগের কারণ হইলেও, তাঁহার কার্য্য তাঁহার নিকট গুরুতর বিষয় ছিল। কর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই তিনি অর্থনৈতিক উৎকর্ষ-জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন—কেমন করিয়া তাঁহার সামান্য মূলধন হইতে সর্ব্বোচ্চ মুনাফা আদায় করা যায় সে কৌশলও শিক্ষা করিলেন। ঐকান্তিক মনঃসংযোগ ও একলক্ষ্য সাধনার ফলস্বরূপ, তাঁহার চরিত্র ক্রমশঃ এরূপ উচ্চগুণসম্পন্ন মহামূল্য আকার ধারণ করিল যে তাহার স্পর্শে, তাঁহার প্রত্যেকটী প্রারব্ধ কর্ম্ম সফলতার স্বর্ণ-বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়িবার অল্পদিন পরেই নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, রাজেন্দ্রনাথ 'লেভল' ও 'থিওডোলাইট' যন্ত্রদ্বয়ের সম্যক্ ও বিস্তৃত ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কেননা কলেজে থাকিতেই তিনি নিপুণ হস্তে এই দুইটি যন্ত্রের চালনা করিতে পারিতেন। এখন তিনি এই উপায়ে তাঁহার পূর্ব্বে নিযুক্ত কণ্ট্রাক্টরদিগের কার্য্যে কতকগুলি ভ্রম বাহির করিলেন। দুই চারি মাসের মধ্যেই, সমস্ত

ভ্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া, পরিদর্শক ইন্‌জিনিয়ার-দিগকে সেগুলি দেখাইয়া, তিনি তাহাদের সংশোধন করিয়া দিলেন। একদিন তিনি ঘটনাক্রমে শুনিতে পাইলেন যে ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লির সাপ্তাহিক পরিদর্শন উপলক্ষে ফেন্‌উইক তাঁহাকে বলিতেছেন যে নূতন কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য এত উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতেছে ও তাহা এতদূর ভ্রমশূন্য যে তিনি একজন মিউনিসিপাল ইন্‌জিনিয়ার কমাইয়া দিয়া কর্ম্মচারী বাবদ কিছু খরচ বাঁচাইতে পারেন। পরবর্ত্তী কথাবার্ত্তায় আরও প্রতীয়মান হইল, যে ফেন্‌উইকের বিশ্বাস, রাজেন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষমতার যে উচ্চ আদর্শ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। এই অনুকূল মত, ফেন্‌-উইকের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়াই, রাজেন্দ্রনাথের পক্ষে নিশ্চয়ই উচ্চ প্রশংসা বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু তাহা লাভ করিয়াও রাজেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত না হইয়া, প্রশংসিত কার্য্যের অধিকতর উৎকর্ষ সাধন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। পরিদর্শক মিউনিসিপাল ইন্‌জিনিয়ারের অন্তর্ধান যেমন এক দিকে তাঁহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের দৃঢ় বিশ্বাস প্রমাণ করিল, সেইরূপ অপরদিকে তাঁহার নিকট নিজ শক্তির পরিমানও প্রকাশিত হইল। সেই সময় হইতেই তিনি বিরক্তিকর পরিদর্শন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, পল্‌তা কারখানার নির্ম্মাণ-কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইলেন।

কার্য্য-শক্তির উচ্চ আদর্শ।

রাজেন্দ্রনাথ পল্‌তায় ছয় মাস কার্য্য করিবার পর, ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লি কলিকাতা করপোরেশন পরিত্যাগ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের চীফ্ ইন্‌জিনিয়ারের পদ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার স্থলে মিষ্টার (পরে স্যর) হেন্‌রি কিম্বার, সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগের সুপারিনটেণ্ডিং ইন্‌জিনিয়ারের পদ হইতে মনোনীত হইয়া, কলিকাতা করপোরেসনের চীফ্ ইনজিনিয়ারের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ব্রাড্‌ফোর্ড লেস্‌লির বিশ্বাসভাজন বলিয়া, রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার নিয়মমত পরিদর্শন নির্ভয় মনে প্রতীক্ষা করিতেন। কিন্তু নূতন ও অপরিচিত চীফ্ ইন্‌জিনিয়ারের পরিদর্শন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির, সুতরাং চিন্তাকুল মনে রাজেন্দ্রনাথ ফেন্‌উইকের সহিত তাঁহার প্রথম পরিদর্শন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ রাজেন্দ্রনাথের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমেই, বিনা পরিচয়ে কিম্বারের সহিত পরিদর্শনে যোগ দিতে হইল বলিয়া, রাজেন্দ্রনাথ একটু দমিয়া গেলেন। তৎপরে, নির্দ্দিষ্ট হারে যে কঠিন মৃত্তিকা কর্ত্তিত হইতেছিল, কিম্বার যখন সেই কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিলেন, তখন এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট কার্য্যের জন্য বর্ত্তমান হার যথেষ্ট নয় বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কৈফিয়ত দিলেন। কণ্ট্রাক্টরের এই অযাচিত কৈফিয়ত এবং হার-বৃদ্ধির প্রস্তাব শুনিয়া, কিম্বার অসন্তুষ্ট হইয়া বক্রমুখে তাঁহার প্রতি যে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলেন,

তাহাতে রাজেন্দ্রনাথের মর্য্যাদা-হানি ও কার্য্য ছাড়িয়া দিবার উপক্রম হইল। কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্য-সম্পাদনের উপর যে তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া রাজেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। এই মীমাংসা যে জ্ঞানপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়ী ও কর্ম্মী, নিজ মনের উপর ভাবপ্রবণতা বা অভিমানের প্রতিক্রিয়া অগ্রাহ্য করিয়া, কাজে লাগিয়া থাকাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। এই কারণে, রাজেন্দ্রনাথ কিম্বারের কর্কশ বাক্য মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিলেন, এবং তিনি দ্বিতীয়বার পরিদর্শনে আসিলে প্রফুল্ল মুখে তাঁহার অনুগমন করিলেন। এই পরিদর্শন রাজেন্দ্রনাথের পক্ষে সাফল্য-মণ্ডিত হইল—সমস্ত দেখিয়া কিম্বার কার্য্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার প্রশংসা করিলেন। স্যর রাজেন্দ্রের স্মরণ হয় যে সেইদিন হইতে কিম্বার আর কখনও তাঁহার সহিত কর্কশভাবে কথা বলেন নাই—প্রত্যুত শেষ পর্য্যন্ত সাতিশয় ভদ্রব্যবহার করিতেন।

ব্যবসায়-জগতে মান অভিমানের স্থানাভাব।

এইরূপ অনুন্নত অবস্থায় আলোচ্য কর্ম্মজীবনের সূচনা হইল। পরিণামে ইহা যে কেবল বঙ্গীয় ব্যবসায়ের ইতিহাসে অতুলনীয় হইয়া উঠিল তাহা নহে, পরন্তু তাহার গৌরব-দীপ্তির নিকট, অন্যান্য অনেক কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিগণের উপন্যাস-সুলভ অদ্ভূত অভ্যুদয় নিস্প্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হইল!

পল্‌তার নির্ম্মাণকার্য্য কণ্ট্রাক্ট অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হইল। চীফ্ ইন্‌জিনিয়ার সমাপ্ত কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সেইস্থানে অন্য কোন নূতন কার্য্য পাইবার সম্ভাবনা না থাকায়, রাজেন্দ্রনাথ কার্য্যান্বেষণে অন্যত্র যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে তাঁহার ভ্রান্তিশূন্য ও সাধুতাসঙ্গত কার্য্য দেখিয়া ফেন্‌উইক মিউনিসিপাল ইন্‌জিনিয়ারকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার অধীনে তখন কোন সুদক্ষ পরিদর্শক কর্ম্মচারী ছিল না। এই অবস্থায় তিনি কিম্বারের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে জল-শোধনের বন্দোবস্ত ও থিতাইবার পুষ্করিণীগুলির সংরক্ষণ (maintenance) তদারক করিবার জন্য রাজেন্দ্রনাথকে কণ্ট্রাক্টররূপে পল্‌তায় নিযুক্ত করা হউক। এই প্রস্তাবে রাজেন্দ্রনাথ সহজেই সম্মত হইলেন।

পল্‌তার সংরক্ষণ-কার্য্য-গ্রহণ।

এবার যে অঙ্গীকার-পত্র প্রস্তুত হইল, তাহাতে প্রত্যেক কার্য্যের বিবরণ, হার ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল। রাজেন্দ্রনাথ হিসাব করিয়া দেখিলেন যে এই কার্য্যে তাঁহার মোটামুটি ১০০০৲ টাকা মাসিক আয় হইবে। স্বাবলম্বনের এই নিরাপদ স্থলে পঁহুছিয়া, তিনি ভাবিয়া দেখিলেন তাঁহার যে অভিভাবক ও উপকারী আত্মীয় দুই বৎসর পূর্ব্বে, সর্‌ভেয়ারের পদ গ্রহণ বিষয়ে অবাধ্যতাবশতঃ, তাঁহাকে গৃহ-তাড়িত করিয়া নিজের ভার লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন—এখন তাঁহার সহিত সদ্ভাব

সংস্থাপনের উপযুক্ত সময়। তিনি অনুতপ্ত না হইলেও, তরুণ কণ্ট্রাক্টর হিসাবে তাঁহার সাফল্য ও নিশ্চিত উচ্চ আয় আত্মীয়-স্বজনকে চমকিত করিয়াছিল। পারিবারিক শাসন-নীতি পূর্ব্বে অমান্য করিলেও, তিনি ক্রমশঃ পারিবারিক গণ্ডীর ভিতর পুনর্গৃহীত হইলেন। কিন্তু পারিবারিক অভিমান-বশতঃ, বাস্তব ব্যবহারে যেন একটু ব্যবধান রহিয়া গেল, বহু বৎসরের পর তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমা লাভ করিলেন।

পারিবারিক শাসন-নীতিও সাফল্যের আপোষ।

সংরক্ষণ-কার্য্য লাভ করিয়া রাজেন্দ্রনাথ প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে আকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এখন আর নির্ম্মাণ-কার্য্যের মত তাঁহার সত্বর বিল-পরিশোধের সম্ভাবনা রহিল না। যে মেসের বন্ধু তাঁহাকে ১০০০৲ টাকা ধার দিয়াছিলেন, তিনি আর অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। এই দুঃসময়ে রাজেন্দ্রনাথ, আগ্রা-যাত্রার পথে পরম উপকারী ও স্নেহশীল মাতুল যোগেশ্বর গাঙ্গুলীর বিষয় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিলেন। যোগেশ পল্‌তা হইতে মাত্র দুই মাইল দূরে বাস করিতেন। রাজেন্দ্র-নাথ তাঁহার নিকট গিয়া আর্থিক আকুলতায় সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যোগেশ দেখিলেন যে তাঁহার ভাগিনেয় এখন সংসারে প্রতিষ্ঠিত ও সফল কর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইয়া, পুরুষের মত পুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। দেখিয়া তিনি স্বভাবতঃই গর্ব্ব অনুভব করিলেন। তাঁহার কোমল হৃদয়ে ভাগিনেয়ের

শুভকামনা স্বতঃই উদিত হইল। তিনি সন্ধান করিয়া জানিলেন যে এক ব্যক্তি তাঁহার জামিনে পাঁচ হাজার টাকা তাঁহার ভাগিনেয়কে ধার দিতে প্রস্তুত আছেন। মাতুল তৎক্ষণাৎ জামিন হইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইহা ব্যক্তিগত জামিন মাত্র বলিয়া, ঋণদাতা এই সর্ত্তে টাকা দিলেন যে তিনি শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা সুদ পাইবেন এবং মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে তত্ত্বাবধায়ক কেরাণীরূপে কার্য্যস্থলে থাকিতে পাইবেন। প্রথম ঋণদাতা দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিত এই নূতন বন্দোবস্ত হইল, যে তিনি অতঃপর লাভের এক-চতুর্থাংশ ও তাঁহার ১০০০৲ টাকার জন্য শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা সুদ পাইবেন।

প্রয়োজনীয় মূলধন-সংগ্রহ।

এইরূপে যথাসম্ভব অল্প মূলধন লইয়া, রাজেন্দ্রনাথ পল্‌তায় তাঁহার সংরক্ষণ-কণ্ট্রাক্টের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি মূলধনের দুশ্চিন্তা মনে আসিতে না দিয়া, পরিদর্শক ইন্‌জিনিয়ারগণের নির্দ্দেশানুসারে করণীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সুফলস্বরূপ, তাঁহার বিলের টাকা পাইতে অধিক বিলম্ব হইত না। অধিকন্তু, সওদাগর ও ব্যাপারীগণ, ক্রমশঃ তাঁহার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে এবং নগদ মুল্য না লইয়া অধিক টাকার দ্রব্য সরবরাহ করিতে লাগিলেন। কণ্ট্রাক্ট-কার্য্যের প্রত্যেক অংশ সুসম্পন্ন করিয়া তিনি যেরূপ সুনাম অর্জ্জন

করিলেন, উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের সহিত সর্ব্বদা সাধু ব্যবহারের দ্বারাও তিনি সমান সুফল লাভ করিলেন। স্যর

কণ্ট্রাক্ট-কার্য্যে সাফল্যের নিগূঢ়নীতি।

রাজেন্দ্রের বিশ্বাস যে কণ্ট্রাক্ট-কার্য্যে সাফল্যের মূল-সূত্র এই যে প্রথমে সামান্যভাবে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে এবং নিজে ছোট বড় প্রত্যেক বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে, কেন না একমাত্র এই উপায়ে কার্য্যের খরচ কমাইবার কল-কৌশল শিখিতে পারা যায়। কার্য্যক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিনই ছোট বড় নানা সমস্যা আসিয়া পড়ে—অভিজ্ঞতা না থাকিলে তুইটী বিভিন্ন কার্য্য-প্রণালীর শিল্প ও অর্থগত আপেক্ষিক মূল্য ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। "যদি কেহ সামান্যভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া কার্য্যদাতা ও সওদাগরগণের সহিত নিয়ত সাধু ব্যবহার করেন, এবং শেষোক্ত লোকের মনে ক্রমশঃ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ধারে অধিকতর দ্রব্য পাইবার সুবিধা লাভ করেন, তবে তাঁহার পক্ষে অল্প মূলধন প্রতিবন্ধক হয় না।"

যতদিন রাজেন্দ্রনাথ পল্‌তায় সংরক্ষণ কণ্ট্রাক্টের কার্য্য করিতে ছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি কলিকাতায় এবং চুঁচুড়ায় সরকারী পূর্ত্ত বিভাগের অধীনে ছোট ছোট নির্ম্মাণ কার্য্যের কণ্ট্রাক্ট একই সময়ে লইতেন। তিনি ধীরে ধীরে স্বাধীন ভাবে বৃহৎ নির্ম্মাণকার্য্য পাইবার পন্থা আবিষ্কার করিতেছিলেন, কেন না তিনি জানিতেন সে সংরক্ষণ কার্য্যের কণ্ট্রাক্ট যে কোন সময়ে শেষ হইতে পারে, এবং ইহাতে

আপাততঃ মাঝামাঝি আয় হইলেও, এরূপ কার্য্য দ্বারা ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা নাই। তিনি পল্‌তায় তিন চারি বৎসর কণ্ট্রাক্ট কার্য্য করিয়া প্রায় ২০,০০০ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই টাকা ও ঋণ-লব্ধ ৬,০০০ টাকার মূলধনের সাহায্যে, বৃহত্তর কার্য্য-সম্পাদনের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহার আত্ম-বিশ্বাস উৎপন্ন হইল।

দৈবদুর্ঘটনায় উচ্চা-কাঙ্ক্ষার গতিরোধ।

যখন রাজেন্দ্রনাথ বৃহৎ কার্য্য পাইবার আশা অন্তরে পোষণ করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন এক দৈব-দুর্ব্বিপাকে তাঁহার উচ্চাভিলাষের স্রোত সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। সেই সময়, তাঁহার নিজ প্রস্তুত নক্সা অনুযায়ী তাঁহার বাংলোর একটি ক্ষুদ্র বহিঃশালা (out-house), পরিদর্শক ইন্‌জিনিয়ারের মঞ্জুর অনুসারে নির্ম্মিত হইতেছিল। এই সামান্য ইরামত ছাদ পর্য্যন্ত উঠিলে, ফেন্‌উইক বারাণ্ডার ঢালু ছাদে লোহার কড়ি ব্যবহার করিতে বলিলেন, কিন্তু কত ডিগ্রি কোণে কড়িগুলি স্থাপিত হইবে, তাহা নক্সা হইতে স্থির করিয়া না দিয়া কড়িগুলি আনাইতে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। রাজেন্দ্রনাথ জানিতেন যে প্রথমে এই কোণ নির্দ্ধারিত না হইলে কড়ির দৈর্ঘ্য অনিশ্চিত থাকিবে। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি স্বভাবতঃই পূর্ব্বে কড়ি আনাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উগ্র-স্বভাব ফেন্‌উইক রাজেন্দ্রের যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া, কড়িগুলি আনাইবার জন্য ও যথাস্থানে

স্থাপনা করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে একবার কর্ত্তৃপক্ষের রূঢ় আচরণে ব্যথিত হইয়া বিক্ষুব্ধ মনোভাব দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার শিল্প-বিদ্যাবিষয়ক নীতি তর্কের বিষয় হওয়ায়, অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ইন্‌জিনিয়ার বলিয়া পরিচিত এক ব্যক্তির অজ্ঞতা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অতর্কিত ভাবে এই বিস্ময়-প্রকাশের ভাষা ফেন্‌উইকের পক্ষে নিন্দাসূচক হইয়া দাঁড়াইল। স্যর রাজেন্দ্রের চরিত্রের এক বিশেষত্ব পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, (৫১ পৃষ্ঠা), অর্থাৎ শিল্প-বিজ্ঞান ও ইন্‌জিনিয়ারিং পেশা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে বাদানুবাদ হইবার সময় তিনি, ব্যক্তিত্বের বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইয়া, বিষয়টীর পৃথক্ সূক্ষ্ম নীতির উপর মন নিবিষ্ট করেন। এইরূপে কতবার তিনি অজ্ঞাতসারে ব্যক্তি বিশেষকে অসন্তুষ্ট এবং লোকের মন অস্থির করিয়া দিয়াছেন। তথাপি তিনি, নিজ ব্যক্তিগত অসুবিধা এড়াইবার জন্য, আপনার বিজ্ঞান-সংক্রান্ত মত কখনও আপোষে শিথিল করিতে সম্মত হন নাই।

বর্ত্তমান ঘটনায় রাজেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর উপযুক্ত হইলেও, তাহাতে যে পরিণামদর্শিতা ও শিষ্টতার অভাব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফেন্‌উইক একজন কণ্ট্রাক্টর শ্রেণীর ব্যক্তির দুঃসাহসিক ও দুর্ব্বিনীত আচরণে অধীর ও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজেন্দ্রনাথকে এই লিখিত আদেশ প্রদান

করিলেন যে তিনি যেন সেই মুহূর্ত্তে জলকলের এলাকার ভিতর সমস্ত নির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ করেন, এবং তাঁহার উপর যে সমস্ত কার্য্যের ভার ছিল, তাহা পরিষ্কার ভাবে ফেন্‌উইকের সহকারীকে বুঝাইয়া দিয়া, তিনি যে বাংলোতে বাস করিতেছেন তাহা তিনদিনের ভিতর খালি করিয়া দেন। ফেন্‌উইক যে সেস্থানে সর্ব্বেসর্ব্বা তাহারই পূর্ণ পরিচয় প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। তাঁহার আদেশ পালন করা ভিন্ন রাজেন্দ্রনাথের উপায়ান্তর রহিল না। চীফ্ ইন্‌জিনিয়ারের নিকট আবেদন করিবার পথ উন্মুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের মতে আংশিক দোষী বিবেচিত হইবার এবং তজ্জনিত ক্ষতির আশঙ্কাও রাজেন্দ্রনাথের মনে আসিল। তথাপি তিনি পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে কলিকাতায় চীফ্ ইন্‌জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই বিষয়ের বিচার প্রার্থনা করিলেন। কিম্বার স্থির হইয়া তাঁহার সমস্ত কথা শুনিলেন, এবং, সাধ্য হইলে, পরদিন প্রাতে পল্‌তায় গিয়া এই বিষয়ের তদন্ত করিবেন বলিলেন। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সত্য সত্যই কিম্বার, নিজ কথা অনুসারে, পরদিন প্রাতে জলকলে উপস্থিত হইলেন। ফেন্‌উইকের সহিত তাঁহার কি কথাবার্ত্তা হইল তাহা রাজেন্দ্রনাথ কখনই জানিতে পারেন নাই; কিন্তু কিম্বার নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিলেন যে রাজেন্দ্রনাথের উপর যে অটল আদেশ প্রয়োগ করা হইয়াছিল,

তাহা ঠিক প্রশস্ত ও ন্যায়-সঙ্গত হয় নাই ; অধিকন্তু তাহাকে এইভাবে কার্য্যচ্যুত করায়, জলকলের নিয়মিত কাজ চালাইবার পক্ষে যে অভাব আবির্ভূত হইল, তাহা পূরণ করা সহজ হইবে না। অপর দিকে, ফেন্‌উইক, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট রাজেন্দ্রের আবেদনে অধিক মাত্রায় কোপান্বিত হইয়া, তাঁহার আদেশ পূনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া দেখিতে একেবারে অস্বীকৃত হইলেন। এ বিষয়ে কিম্বার ও তাঁহার মধ্যে তর্ক-বিতর্ক অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছিল, তাহাতে এক এক সময় উভয়েরই মেজাজ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ফেন্‌উইক স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত ইন্‌জিনিয়ার এবং আলোচিত কার্য্যে অভিজ্ঞতর বলিয়া, কিম্বার অবশেষে, দুঃখের সহিত রাজেন্দ্রনাথের উপর যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা বজায় রাখিতে বাধ্য হইলেন।

তিন দিনের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ অধ্যুষিত বাংলো ছাড়িয়া দিলেন, এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার কৃত কার্য্যের সমস্ত বিল পেশ করিলেন। এখন ফেন্‌উইকের প্রকৃতিগত শত্রুতা

বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্ঘর্ষের ফল।

বাহিরে প্রকাশিত হওয়ায়, রাজেন্দ্রনাথ, যুবা বয়স ও সমান উগ্র মেজাজ বশতঃ, তৎপ্রদত্ত অসম্ভ্রম নির্ব্বিবাদে সহ্য না করিয়া, প্রতিবিধানে যত্নবান্ হইলেন। অতঃপর ফেন্‌উইককে বিপদাপন্ন ও অপদস্থ করাই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। এই সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল, কেন না পল্‌তার সংরক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত

সমস্ত নিপুণ শ্রমিকদলকে তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন। পুরা দুইমাস তিনি তাহাদিগকে বসাইয়া রাখিয়া বেতন দিতে লাগিলেন, তাহাতে ফেন্‌উইকের বিলক্ষণ বিরক্তি ও অসুবিধা উপস্থিত হইল, কেন না বিশেষ বিশেষ কার্য্যে শিক্ষিত এই সমস্ত লোকের মত আর একদল নিপুণ শ্রমিক সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল। এই কারণে কিছু দিনের জন্য কলিকাতার জল-সরবরাহ-কার্য্যে সমূহ ক্ষতি সঙ্ঘটিত হইল। যে দুইমাস রাজেন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ পল্‌তা কারখানার বাহিরে অবস্থান করিতেছিল, তাহার মধ্যে তিনি অন্য নির্ম্মাণকার্য্য পাইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। বহুদিন এইরূপ নিষ্কর্ম্মা শ্রমিকদলের বেতন যোগান অসম্ভব, সেইজন্য তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ অবশেষে নিজ নিজ গ্রামে চলিয়া গেল, অল্পসংখ্যক লোক জলকলে ফিরিতে বাধ্য হইল। দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী সঙ্ঘর্ষণের উত্তেজক প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইল। এই প্রকাশ্য বিরোধের তাৎপর্য্য প্রণিধান যোগ্য, কেন না ইহার ফলে কার্য্য-নির্ব্বাহ সম্বন্ধে নিত্য সংশয়ের ভাব কাটিয়া গেল, এবং বিরোধী ব্যক্তিদ্বয়ের মনে, পরস্পরের চরিত্র-বল সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিল।

রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহার ছাত্রজীবনের সেই পুরাতন মেসেই পুনঃপ্রবেশ করিলেন। তিনি

কলিকাতা করপোরেশনের নিকট হইতে সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া, তাঁহার বাজার দেনা পরিশোধ করিলেন, এবং তাঁহার প্রথম মহাজন দেবেন্দ্রনাথ সেনের সমস্ত মূলধন ফিরাইয়া দিয়া, তাঁহার সহিত অংশীদার-সম্বন্ধ যথাবিধি বিচ্ছিন্ন করিলেন। অধিকন্তু তিনি, তাঁহার মাতুলের বন্ধুর নিকট হইতে ঋণলব্ধ টাকার অর্দ্ধেক, অর্থাৎ ২৫০০৲ টাকা প্রত্যর্পণ করিলেন। এই সমস্ত হিসাব নিকাশ করিয়া তিনি দেখিলেন যে তখনও তাঁহার হাতে, দ্বিতীয় ঋণের বাকী টাকা সমেত, প্রায় ২০,০০০ টাকা মজুত আছে। যে কণ্ট্রাক্টর প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই টাকা রাজৈশ্বর্য্যের সমান! এই আপেক্ষিক বিভব হাতে পাইয়া, রাজেন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ও কার্য্যশক্তি বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার মূলধন ও কার্য্যদক্ষতার সাহায্যে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে, অতঃপর তিনি চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলায় সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগে নির্ম্মাণ কার্য্য পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পূর্ত্ত-বিভাগের কণ্ট্রাক্ট-সূত্রে বিদেশ-ভ্রমণ।

বিরক্তির আবর্ত্তে পড়িয়া পলতার কণ্ট্রাক্ট অকালে লয়-প্রাপ্ত হওয়ায়, একমাত্র সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগেই আশাপ্রদ কার্য্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। এই বিভাগের নির্দ্ধারিত হার হইতে লাভ করিবার সুবিধা পাওয়া যাইত, এবং বিলের টাকা সত্বর ও পুরামাত্রায় আদায় হইত। রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতা

ছাড়িয়া কুষ্টিয়ায় নিজ মোকাম (head-quarters) স্থাপনা করিলেন, এবং তথায় ও রাণাঘাট, মাগুরা প্রভৃতি তদানীন্তন উন্নতিশীল মফঃস্বল-কেন্দ্রে, যে কোন সরকারী নির্ম্মাণকার্য্য পাওয়া যাইত তাহা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে, অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি প্রায় এক বৎসর বিদেশ-ভ্রমণে কাটাইয়া দিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ যে উপজীবিকা মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা একদিকে যেমন স্বাধীন ধরণের, অপরদিকে তেমনই অনিশ্চিত। এ হেন জীবিকার সুবিধা অসুবিধার বিষয় যে তিনি সেই সময় গভীরভাবে চিন্তা করিতেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। বৃত্তি-নির্ব্বাচনে যে বিশেষ সাহস বিপদ-বরণেরই নামান্তর, সেই সাহস-বলে বলীয়ান্ যুবক-সঙ্ঘের সৃষ্টি, বঙ্গে প্রচলিত ইংরাজী শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে সুসাধ্য হয় নাই। সরকারী চাকরীতে 'যেমন তেমন করিয়া ঘি-ভাত',—ইহাই ছাত্র সাধারণের মনোবৃত্তি ছিল। পৃথক্ পথের পথিক রাজেন্দ্রনাথ, দারুণ অভাবে পড়িয়াও, অবজ্ঞাভরে চাকরী প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এখন তিনি কণ্ট্রাক্টরের স্বাধীন পেশায় কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সুতরাং তিনি এই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে কোন সাময়িক বিফলতা তাঁহাকে চিহ্নিত পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। তাঁহার পক্ষে দুঃসাহসিকতার আকর্ষণ পূর্ব্বের মতই প্রবল ছিল।

এই কারণে তিনি পল্‌তার কার্য্যচ্যুতি সাধারণ ঘটনা হিসাবেই দেখিতেন। বস্তুতঃ এই ঘটনা উপলক্ষে তিনি বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু অনুরূপ আর্থিক সুবিধা হয় নাই। কুষ্ঠিয়ায় অবস্থান করিয়া, রাজেন্দ্রনাথ নিজ পেশার স্থায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার একরোখা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকায়, দুর্ভাগ্য রোধ করিবার জন্য কার্য্যে অধ্যবসায় বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

যখন রাজেন্দ্রনাথের ভাগ্য-গগনে ঘনমেঘ ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হইতেছিল, তখন সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘ কাটিয়া গেল, দিবালোক প্রকাশিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে "উদ্যোগিনং পুরুসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী" (উদ্যোগী পুরুষ-প্রবরেব লক্ষ্মীলাভ হয়) এই মহাসত্য প্রতিপন্ন হইল। একদিন প্রভাতে তাঁহার নিকট ফেন্‌উইকের এক পত্র উপস্থিত হইল। স্যর রাজেন্দ্র পরে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া এই পত্র খুলিয়াছিলেন। পত্রে ফেন্‌উইক তাঁহাকে সুবিধামত পল্‌তায় গিয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অদৃষ্টচক্রের এই বিবর্ত্তনে, রাজেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। পত্রের ছত্রের মধ্যে ফেন্‌উইকের নম্রতা ও অনুতাপের আভাস পাইয়া, তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে পল্‌তায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ফেন্‌উইক, স্বকীয় বিশিষ্ট প্রকৃতি

অনুসারে, তাঁহার অতীত অশিষ্টতার জন্য রাজেন্দ্রনাথের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহার হস্ত স্পন্দন করিয়া গত বিষয় ভুলিয়া যাইতে বলিলেন। ফেন্‌উইক সরল ভাবেই স্বীকার করিলেন, যে তাঁহার কার্য্য সে সময় বিঘ্নসঙ্কুল, এবং বলিলেন যে যদি রাজেন্দ্রনাথ পুনর্ব্বার সংরক্ষণ-কণ্ট্রাক্ট গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশুভ ব্যাপারজনিত তাঁহার সমস্ত ক্ষতি উদারভাবে পূরণ করিয়া দিতে ফেন্‌উইক অঙ্গীকার করিতেছেন। রাজেন্দ্রনাথ কণ্ট্রাক্ট গ্রহণ করিলেন, এবং সমান উদারতা পরবশ হইয়া ফেন্‌উইককে আশ্বাস দিলেন যে তিনি সংরক্ষণ-কার্য্যের সমস্ত গোলযোগ যথাশক্তি মিটাইয়া দিবেন। ফেন্‌উইকের মুখের কথাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট—তিনি ক্ষতিপূরণ বিষয়ে কোন লিখিত অঙ্গীকার-পত্র চাহেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ আবার তাঁহার পুরাতন বাংলোয় ফিরিয়া আসিলেন, এবং কলিকাতার জল-সরবরাহের কারখানা সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম রাখিবার দায়িত্ব পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া সংরক্ষণ-কর্ত্তারূপে তথায় অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ফেন্‌উইকের নিকট হইতে কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মূল্য আদায় করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যের জন্য যথাযোগ্য পারিশ্রমিক মাত্র গ্রহনীয়—ইহাই তাঁহার মত। যে সমস্ত শিক্ষিত শ্রমিক তাঁহার সহিত একযোগে জলকল

মেঘক্তমু অদৃষ্টগগন; উন্নত চরিত্রের স্ফুরণ।

ত্যাগ করিয়াছিল, তিনি আবার তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, নিজ সত্য পালন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কার্য্যের জটিলতা আয়ত্ত করিয়া লইলেন, এবং পূর্ব্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বলে সংরক্ষণ-যন্ত্র আবার নিপুণভাবে চালাইতে লাগিলেন। আবার তথায় মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হইল।

এইরূপে পল্‌তার সংরক্ষণ-কার্য্য কলের মত নিখুতভাবে চালাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত সমাপন করিয়া, রাজেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে তাঁহার অন্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার যথেষ্ট সময় আছে। তখন তিনি বৃহৎ নির্ম্মাণ-কার্য্য লইবার উদ্দেশ্যে, যিনি প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাইতে পারেন এরূপ লোকের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার এক আত্মীয়, ভূতনাথ মুখার্জ্জি নামক এক ধনী ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। যে সমস্ত ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ, কর্ম্মচারী ও অনুচরবর্গের বৃহৎ দলবল লইয়া, প্রতিবৎসর শীতকালে কলিকাতায় আগমন ও অবস্থান করিতেন, তাঁহাদের সকলের জন্য খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করিবার কণ্ট্রাক্ট লইয়া, ভূতনাথ প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত রাজেন্দ্রনাথের কথাবার্ত্তায় ইহা স্থির হইল যে তিনি একদিকে ইন্‌জিনিয়ারিং ব্যবসায়ের অর্দ্ধেক অংশীদার হইবেন, অপরদিকে বিনা সুদে এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত মূলধন ব্যবসায়ে খাটাইবেন এবং অংশীদারের

ধনী অংশীদার লাভে ব্যবসায়-জীবনের সূত্রপাত।

নিয়মিত কর্ত্তব্য হিসাবে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্ত কর্ম্ম তদারক করিবেন—তাহাতে রাজেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া শিল্পগত বা ইন্‌জিনিয়ারিং ব্যাপারে নিজের সমস্ত সময় প্রয়োগ করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় বার পল্‌তার কার্য্য এক বৎসর চলিবার পর, টি, সি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানির নামে এই অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই সময় হইতেই, স্যর রাজেন্দ্রের প্রকৃত ব্যবসায়-জীবন আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

অতঃপর পল্‌তার সংরক্ষণ-কার্য্যে অনুক্ষণ রাজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মনোযোগ দিবার প্রয়োজন না থাকায়, তিনি পল্‌তার বাংলো ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী মনিরামপুর গ্রামে বাসস্থান মনোনীত করিলেন। পল্‌তায় দ্বিতীয়বার কার্য্য লাভে এবং ভূতনাথের সহিত অংশীদারত্ব স্থাপনে, রাজেন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, মাতা ও পত্নীকে স্বচেষ্টাপ্রসূত সুসজ্জিত গৃহে সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতে ব্যগ্র হইলেন। তাঁহাদিগকে অচিরে মনিরামপুরে নবগৃহে আনয়ন করিলেন। এই আনন্দজনক পরিবর্ত্তনে তাঁহার মাতার অশেষ উপকার হইল, কেননা রাজেন্দ্রনাথের বাল্যাবস্থা হইতে যে অপস্মার রোগ তাঁহার মাতার পক্ষে প্রায় চিরন্তন হইয়া গিয়াছিল, তাহা এই সময়ে সহসা অন্তর্হিত হইল। বাল্যবয়স হইতেই তাঁহার পুত্রের উপর তিনি যে উচ্চ আশা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া

মাতা ও পত্নীর নবগৃহ-প্রবেশ।

ছিলেন, সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ, তাঁহার পীড়িত স্নায়ু-মণ্ডলের পক্ষে সুস্নিগ্ধ প্রলেপের মত আরামদায়ক হইয়া উঠিল। অপরদিকে, মাতার বিশ্বাসের উপযুক্ত হইবার জন্য স্যর রাজেন্দ্র প্রথম জীবনে যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে অতীব প্রশংসনীয়।

মনিরামপুরে থাকিবার সময় রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার এবং অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিবার অবসর ও সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি হুগলীতে আদালত বাটী নির্ম্মাণ, ও কতকগুলি মেরামত কার্য্যের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কণ্ট্রাক্ট পাইলেন। তদুপলক্ষে প্রাতে পল্‌তার কার্য্য পরিদর্শন, এবং তাহার পর গঙ্গা পার, ও উত্তরগামী হইয়া ব্যারাকপুর হইতে হুগলীতে গিয়া নূতন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, তাঁহার দৈনিক করণীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তখন মোটর-বোটের প্রচলন হয় নাই। সাধারণ ফেরী ষ্টীমারের সংখ্যা অত্যল্প ও তাহাদের যাতায়াতের সময় অনিশ্চিত ছিল। এদিকে রাজেন্দ্রনাথ সময় সম্বন্ধে আজীবন নিষ্ঠাবান্—জীবনের সেই যুগে পল্‌তা-হুগলী পথে অধিক সময় ক্ষেপন করিবার মত অবস্থা তাঁহার ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ষোল দাঁড়বিশিষ্ট এক অনতিবৃহৎ বজরা ক্রয় করিতে হইল। এইরূপে সময়-সমস্যার কিয়ৎ পরিমানে সমাধান হইল। তথাপি তাঁহাকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এমন একটি

কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে হইল যাহা দ্বারা, বিভিন্ন স্থানে তাঁহার কার্য্যের অংশবিশেষ অপ্রধান কণ্ট্রাক্টরদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া ও প্রধান কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে রাখিয়া, কার্য্যসমূহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশের কঠোর তত্ত্বাবধান করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি বিষয়ে প্রথমে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই, কেননা তাঁহার আশঙ্কা হইল যে সাময়িক পরিদর্শন যতই সূক্ষ্ম ও কঠোর হউক না কেন, কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে প্রধান তত্ত্বাবধায়কের অনুপস্থিতি উপলক্ষে চারিদিকে চেষ্টার শৈথিল্য উৎপন্ন হইবেই হইবে। তথাপি তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার নিয়মিত কার্য্যাবলী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় ও নানা বিষয়ে মনেযোগ দিবার আবশ্যক হওয়ায়, তাঁহার পক্ষে দায়ীত্ব বিভাগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সেই জন্য তিনি দৈনিক পরিদর্শন, সূক্ষ্ম ও কূটপ্রশ্ন, এবং ব্যক্তিগত আলোচনা দ্বারা প্রত্যেক সম্পাদিত কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব রাখিয়া, কার্য্য-বিভাগ-প্রণালী প্রসারিত ও নির্দ্দোষ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রণালীর পরীক্ষা যথা সময়ে সফল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তাঁহার কার্য্য-প্রণালীর উৎকর্ষ এবং তাঁহার পরিদর্শনের কার্য্য-সাধকতা ও ক্ষিপ্রকারিতা বিষয়ে চিফ্ ইন্‌জিনিয়ার, হুগলীর কার্য্য সমাপ্তি প্রসঙ্গে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বিভক্ত দায়িত্ব সত্ত্বেও সাফল্য।

এই সময়ের একটি ঘটনা স্যর রাজেন্দ্রের মানসপটে অঙ্কিত হইয়া আছে। তাহাতে আর একটু হইলেই তাঁহার কর্ম্মজীবন অকালে লয়-প্রাপ্ত হইত। একদিন তিনি নিয়মিত পরিদর্শন-কার্য্যে নৌকাযোগে ব্যারাকপুর হইতে হুগলীতে যাইতে ছিলেন। নদীর স্রোত প্রতিকূল থাকায়, দাঁড়ীগণ পশ্চিমতীর ঘেঁসিয়া যাইতেছিল, এবং গমনেও বিলম্ব হইতেছিল। তখন চৈত্রমাস, বেলা প্রায় একটা—রাজেন্দ্রনাথ প্রখর রৌদ্রতাপ এড়াইবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই নৌকা-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সহসা নদীতে কোটালের বাণ আসিল। অমাবস্যা পূর্ণিমার সময় বলিয়া, তাহার জন্য মাঝির প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তাহার অমনোযোগ বশতঃ, এক প্রকাণ্ড ঢেউ আড়াআড়ি ভাবে নৌকায় বিষম ধাক্কা লাগাইয়া তাহাকে একেবারে উল্‌টাইয়া দিল। রাজেন্দ্রনাথ কতকটা ভারী পরিচ্ছদ সমেত জলে পড়িয়া গেলেন। ঢেউ এর পর ঢেউ তাঁহার উপর দিয়া যাইতে লাগিল—পরিচ্ছদের ভারে বিপন্ন হইয়া সন্তরণ-শক্তি সত্ত্বেও তিনি ভাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। হুগলীর দুই তিন মাইল দক্ষিণে কাঁক্‌শ্যালী গ্রামের সম্মুখে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। নৌকা যেখানে ডুবিয়াছিল, তাহার নিকটেই বসু নামক রাজেন্দ্রনাথের এক বন্ধু বাস করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে বসু-গৃহিণী সেই সময় বাটীর ছাদ হইতে নদীর দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তিনি নৌকা ডুবিতে

দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উচ্চৈস্বরে স্বামীকে ডাকিলেন—স্বামী দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলেন যে তখন প্রবল স্রোত রাজেন্দ্রনাথকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে বসু মহাশয় দুইটি জেলে ডিঙ্গি অধিকার করিয়া বসিলেন—তাহারাও তখন বাণের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। তাঁহার হুকুমে একটি ডিঙ্গি রাজেন্দ্রনাথের দিকে অগ্রসর হইল। একেবারে শেষ মূহূর্ত্তে, যখন তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, মাঝি তাঁহাকে টানিয়া তুলিল। সে সময় তিনি মরিয়া হইয়া ভাসিয়া থাকিবার জন্য যে চরম চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা স্যর রাজেন্দ্রের এখনও স্মরণ হয়। অবশেষে যখন তিনি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন, তখন দারুণ স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া বশতঃ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বসু মহাশয় তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া প্রাথমিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন, এবং অবিলম্বে ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরদিন তাঁহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন হইলে, তিনি আবার পুরাতন মেসে যাওয়াই স্থির করিলেন। তথায় তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু মতিলাল, এতদিনে ডাক্তারী পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া, মেডিক্যাল কলেজে একটী কার্য্যসূত্রে অন্যান্য ডাক্তার বন্ধুগণের সহিত বাস করিতেছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের চিকিৎসায় ও বন্ধুবর্গের শুশ্রূষায়, রাজেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিলেন, কিন্তু তিনি এমন কঠোর

মারাত্মক বিপদে ভগবানের করুণা।

স্নায়বিক আঘাত পাইয়াছিলেন যে তাঁহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে অনেক সময় লাগিল।

এই আশ্চর্য্য ঘটনায়, একদিকে যেমন "রাখে কৃষ্ণ মারে কে?" এই প্রবাদ-বাক্য সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, অপরদিকে তেমনই, স্যর রাজেন্দ্র যে ঈশ্বরানুগৃহিত এবং পূর্ত্ত-কার্য্য ও শ্রমশিল্পজগতে ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত, এরূপ সিদ্ধান্তের কারণও প্রকাশিত হইল।

উপরোক্ত দুর্ঘটনাজনিত কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য-লাভ করিবার পর, রাজেন্দ্রনাথের সাংসারিক দুঃসময় উপস্থিত হইল। তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ ও সন্তান-সম্ভাবনা হওয়ায়, তাঁহার মাতা পুত্রবধূকে লইয়া ভাব্‌লায় চলিয়া গেলেন। রাজেন্দ্রনাথ অগত্যা মনিরামপুরের বাস উঠাইয়া কলিকাতায় পুরাতন মেসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে প্রত্যহ ব্যারাকপুর ও অন্যান্য স্থানে কাজ দেখিতে যাইতেন। কার্য্যের দূরত্ব ও যান-বাহনের অসুবিধা বশতঃ, তাঁহার দৈনিক কর্ম্ম কঠিন হইয়া পড়িত, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেই আনন্দ লাভ করিতেন! মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সতর্কতার হ্রাস হইত না—কোনদিন তাঁহার তালিকানুযায়ী কোন পরিদর্শন করণীয় হইলে তাহা ঠিক সেই দিনে সম্পাদনেও ক্রুটী হইত না। ছয়মাস পরে, তাঁহার পত্নী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন, কিন্তু

ভগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ আনুসঙ্গিক জটিল রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিন পরেই পরলোক গমন করিলেন। যদিও আটবৎসর-ব্যাপী বিবাহিত জীবনের মধ্যে অল্প সময়ই রাজেন্দ্রনাথ পত্নীর সহিত একত্র বাস করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পত্নীবিয়োগ দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শোকে মুহ্যমান হইয়া, এবং সংসারে নিতান্ত একাকী—এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার মাতা গ্রামে থাকিয়া, মাতৃহীন শিশুকে পালন করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে, সেই শিশুরও মৃত্যু হইল। তখন এক বৃদ্ধ মাতা ভিন্ন নিজ সংসারে একান্ত নিঃসঙ্গ হইয়া, রাজেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন যে গার্হস্থ্য বিপদের বিষম আঘাতে তাঁহার সৌভাগ্য-তরণী চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু পুরুষ বিস্মৃতিশীল জীব—মানসিক চাঞ্চল্য তাহার মূল চরিত্রের এক ক্ষুদ্রাংশমাত্র। সময়ের চিকিৎসা-গুণে, দুঃখ দূরীভূত ও নিঃসঙ্গ-ভাব নিবারিত হইয়া যায়। কয়েক মাস পরেই, রাজেন্দ্রনাথের কার্য্যে আসক্তি পুনর্জীবিত হইল এবং তাঁহার পূর্ব্ব উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি ফিরিয়া আসিল। যখন তাঁহার বিয়োগ-দুঃখের তীব্র ব্যথা মন্দীভূত হইল, তখন চারিদিক হইতে তাঁহার নিকট পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব ও অনুরোধ আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে তাঁহার মাতার পীড়াপীড়িই তাঁহার পক্ষে অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল।

পত্নী ও পুত্র বিয়োগ।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে ভারতীয় পিতামাতার নিকট বংশানুক্রম রক্ষার আদর্শ ধর্ম্মের অনুশাসনের মতই পবিত্র ও পালনীয়। যতদিন রাজেন্দ্রনাথের শিশুপুত্র জীবিত ছিল, ততদিন তাঁহার পুনর্ব্বিবাহের জন্য মাতা পীড়াপীড়ি করেন নাই। কিন্তু শিশুর মৃত্যুর পর, রাজেন্দ্রের মাতার এই দৃঢ় মনোভাব হইল যে কোন উপায়ে বংশানুক্রম রক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, অতঃপর তাঁহার সংসারে জীবন ধারণই বৃথা। এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি বিবাহে পুত্রের সম্মতি লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজেন্দ্রনাথের বয়স ছাব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। যদিও তিনি নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার বর্ত্তমান স্বাধীন ও সচ্ছল অবস্থায়, পুরাতন প্রথায় বিবাহ, অর্থাৎ মাতার নির্ব্বাচনমূলক বিবাহ, অসঙ্গত হইবে, তথাপি তিনি অধিকদিন মাতার নির্ব্বন্ধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে বিবাহে সম্মতি দিতে হইল। একবার সম্মতি দিয়া, তিনি পাত্রীনির্ব্বাচন বিষয়ে কোনরূপ তর্ক তুলিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং বোধ হয় এখনও আছে, যে ভারতীয় সংসার ও সমাজ গঠনের বর্ত্তমান অবস্থায়, বিবাহে পিতামাতার মনোনয়নই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নারীজাতীর অবরোধ ও বাল্যবিবাহের মত নিষ্ফল ও অনিষ্টকর প্রথার উচ্ছেদ সাধনে তিনি অতিশয় উৎসাহী।

পুনর্ব্বিবাহের ইতিহাস।

নারীর প্রাপ্য পূর্ণ অধিকার, ও শিক্ষা বিষয়ে পুরুষের সমান সুযোগ প্রদানেরও তিনি একজন বিশিষ্ট সমর্থক। কিন্তু যুবক-যুবতীর অবাধসাক্ষাৎমূলক যে ব্যক্তিগত পতি-পত্নী নির্ব্বাচন, পাশ্চাত্য জগতেও চিন্তাশীল ও কৃষ্টি-প্রাপ্ত (Cultured) মনিষীগণ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন, এ দেশের ব্যক্তিবিশেষ যে সেই পাশ্চাত্য প্রথা লইয়া নিরাপদে পরীক্ষা করিতে পারেন, ভারতীয় সমাজের শিক্ষা জ্ঞান ও সংস্কার তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল—ইহাই স্যর রাজেন্দ্রের মত। কোন কোন স্থানে যে এরূপ অন্ধ অনুকরণের বিষময় ফল হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নারীত্বের উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতায় উচ্চশিক্ষিত পুত্র কন্যাগণেরও স্মরণ রাখা উচিত যে পিতামাতার দীর্ঘতর জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সংসারের ও মানব-চরিত্রের বিস্তৃত পরিপক্ক জ্ঞান উপেক্ষনীয় নহে। ব্যক্তিগত মনোনয়ন যদি তাহাদের এতই প্রিয় ও বিবাহিত জীবনের পক্ষে আবশ্যকীয় বলিয়া মনে হয়, তবে অন্ততঃ পিতামাতার মনোনীত দুই চারিটী পাত্রপাত্রীর মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত, নতুবা যুবাবয়সে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ ও নিজ নিজ ভাব-প্রবণতার উপর নির্ভর করিলে, বিবাহিত জীবনে দীর্ঘস্থায়ী সুখের আশা করা দুরাশা মাত্র।

বিবাহে স্বাধীন নির্ব্বাচন বনাম পিতামাতার উপদেশ।

নূতন জীবন-ধারার প্রারম্ভ হিসাবে, রাজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পরিণয় সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য যে বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্তের ভার তাঁহার মাতার হাতে ছিল। মাতা কোন ধনী পরিবারের ভিতর পাত্রীর অন্বেষণ করেন নাই। কী ধরণের বালিকা তাঁহার পুত্রের ঠিক উপযুক্ত হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার মনে প্রায় নিশ্চিত ধারণা ছিল। অনেক অনুসন্ধানের ফলে, তিনি একটী বালিকাকে মনোনীত করিলেন। সেই বালিকাটীর বয়স অল্প হইলেও, তাহার গুণাবলী ও চলনগৌরব তাঁহার উচ্চশির পুত্রের উপযুক্ত ছিল। হরিহরপুর লেডী যাদু মুখার্জ্জির জন্মস্থান। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না, এবং শৈশবেই তিনি পিতৃহীনা হইয়াছিলেন। তাঁহার পালন কর্ত্তা মাতামহ, চরিত্র বলে বলীয়ান্ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তিনি পরিবারস্থ পুত্র কন্যার মনে, সুন্দর কর্ত্তব্য-জ্ঞান শিক্ষাদ্বারা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের মাতা, পূজা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন, এবং ঠিক এইরূপ পরিবার হইতেই নিজ পুত্রবধূ পাইবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি পুত্রের নিকট কন্যাপক্ষের সমস্ত পারিবারিক সদ্‌গুণ বর্ণনা করিলেন, কিন্তু মনোনীত পাত্রীর নিজ গুণাবলীর বিষয় কিছুই বলিলেন না। রাজেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ সে বিষয় জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন না, কিন্তু

পত্নী-নির্ব্বাচনে মাতার প্রয়াস।



রাজেন্দ্রনাথ—(৪০ বৎসর বয়সে)

এই বিবাহের ভাবীফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারিলেন না। যথাসময়ে শুভলগ্নে মাতার কর্ম্মশক্তি ও পূণ্যবলে বিবাহ অনুষ্ঠান ও উৎসব নির্ব্বিঘ্নে ও সমারোহে সম্পাদিত হইল।

মূর্ত্তিমতী সৌভাগ্য-লক্ষ্মী।

এইরূপে একটি পরম সুখসমৃদ্ধিময় যুগল জীবন-যাত্রা আরম্ভ হইল। তাহা শুধু সমস্ত পরিবারের পক্ষে কল্যাণকর ও আনন্দের উৎস হইয়া উঠে নাই, পরন্তু যে কেহ, মমতা করুণা ও মাতৃস্নেহের জীবন্ত প্রতিমাস্বরূপ সেই মাধুর্য্যময়ী মহিলার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছেন, তিনিই ধন্য হইয়াছেন। রাজেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব সংশয় সত্ত্বেও, যে দিন যাদুমতী দেবী তাঁহার জীবনের অংশভাগিনী হইয়া আসিলেন, সেই দিন তাঁহার পক্ষে অতি শুভ দিন, কেননা সেই দিন হইতে তাঁহাকে আর পশ্চাদ্দৃষ্টি করিতে বা পশ্চাদ্গামী হইতে হয় নাই। সেই দিন হইতে তিনি সাফল্যের পর সাফল্য লাভ করিয়া, ইঞ্জিনিয়ারিং ও শ্রমশিল্প জগতে অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েক যুগের মত সাধিত কার্য্য পুঞ্জীভূত করিয়া দিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব কর্ম্ম-মন্দির গঠনে তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী কতদূর সহায়তা করিয়াছেন তাহার পরিমাপ করা সম্ভব নহে, কিন্তু এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে লেডী যাদুমতী দেবী কেবল আদর্শ-পত্নী ও আদর্শমাতার দৃষ্টান্তস্বরূপ নহেন, অধিকন্তু স্থির

রাজেন্দ্রের সংসারে পূণ্য-প্রদীপরূপে বিরাজিত থাকিয়া, পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান-কর্ত্রী, এবং তাঁহার কর্ম্মজগতে নিজ অসামান্য সহজপ্রবৃত্তি বলে (through her wonderful instinct) সেই কর্ম্মবীরের অনুপ্রাণনা (inspiration) ও উৎসাহদাত্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।



মাননীয়া লেডী মুখার্জ্জি

পরিশিষ্ট

অবশিষ্ট কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১৮৮৩-১৮৮৫—কলিকাতার জলসরবরাহের জন্য কলিকাতা হইতে পল্‌তা পর্য্যন্ত ৪০ ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট পাইপ স্থাপন উপলক্ষে, তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে পাইপ ক্রয় করিয়া তাহার স্থাপনার জন্য পৃথক কণ্ট্রাক্ট দিয়া, কলিকাতা করপোরেশান প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ বাঁচাইলেন। ইহার ফলে তাঁহার নিজের প্রভূত যশঃ ও একলক্ষ টাকা লাভ হয়।

১৮৮৫-১৮৮৮—তাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে, ইউরোপীয় কণ্ট্রাক্টরগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও, টি, সি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানি প্রথম শ্রেণীর কণ্ট্রাক্টর বলিয়া পরিগণিত হইল, এবং পল্‌তার জলকলের বিস্তার-সংক্রান্ত নির্ম্মাণ-কার্য্যের অধিকাংশ, কণ্ট্রাক্টসূত্রে পাইয়া বিলক্ষণ লাভ করিল।

ইউরোপীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ীগণের সহিত, অবিরত চেষ্টা দ্বারা ক্রমশঃ বন্ধুতা স্থাপন।

১৮৮৮-১৮৯০—আগ্রার জলকলের কণ্ট্রাক্ট প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আগ্রা গমন; চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার হিউজ সাহেব রচিত নক্সার কতকগুলি ভ্রম প্রদর্শন; এই জলকলের জন্য

সর্ব্বনিম্ন টেণ্ডার দিয়া এবং আগ্রা মিউনিসিপালিটির সুপারিশ সত্ত্বেও, ভারতীয় ব্যবসায়ী বলিয়া কণ্ট্রাক্ট লাভে বঞ্চিত হইলেন। (পরবর্ত্তী ইউরোপীয় ব্যবসায়ী কণ্ট্রাক্ট পাইলেন)

এলাহাবাদ জলকলের টেণ্ডার দিবার জন্য হিউজ সাহেবের অনুরোধ, এবং কোন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর সহিত একযোগে টেণ্ডার দিবার জন্য ব্যক্তিগত পরামর্শ। এই সূত্রে চারি পাঁচটি কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় ব্যবসায়-কেন্দ্র (firm) হইতে সহযোগিতার প্রতিদানে অধীনস্থ কর্ম্ম ও কমিশন দিবার প্রস্তাব; প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। অবশেষে কলিকাতাস্থ ওয়ালস্ লভেট কোম্পানির অ্যাকুইন মার্টিন সাহেবের সম্মানসঙ্গত প্রস্তাবে এক-তৃতীয় লভ্যাংশ সর্ত্তে তাঁহার সহিত সহযোগিতায় স্বীকার, এবং একত্রে এলাহাবাদ গমন। শেষ মুহূর্ত্তে উভয়ের বহুযত্ন ও পরিশ্রম-প্রসূত টেণ্ডার চুরি। উভয়ের পাঁচঘণ্টা-ব্যাপী কঠিন মানসিক পরিশ্রমের পর, রাজেন্দ্রনাথের অসামান্য স্মরণ শক্তির সাহায্যে, টেণ্ডার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনঃ প্রস্তুত হওয়ায়, এলাহাবাদ জলকলের কণ্ট্রাক্ট লাভ। উভয়ের যুক্ত নিরাশা, আশঙ্কা, কেন্দ্রীভূত পরিশ্রম ও শেষ সাফল্যসূত্রে মার্টিন কোম্পানী নামক বৃহৎ কারবারের অঙ্কুরোদ্গম।

১৮৯০-১৮৯২—জলকল নির্ম্মাণ উপলক্ষে এলাহাবাদে প্রবাস; চুক্তির সময়ের ভিতর (এবং পূর্ব্বারব্ধ আগ্রার

জলকল নির্ম্মাণের অগ্রে) সমস্ত কার্য্য সম্পাদন ; এলাহাবাদ জলকলের উন্মোচন-সভায় বড়লাট লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউনের প্রশাংসালাভ।

ইউরোপীয় কণ্ট্রাক্টর দ্বারা আগ্রার জলকল নির্ম্মাণে অনতিক্রমনীয় বাধা উপস্থিত হওয়ায়, যুক্তপ্রদেশ সরকার কর্ত্তৃক আহুত হইয়া প্রস্তাবিত উচ্চ পারিশ্রমিক লইতে অস্বীকৃত হইলেন, এবং অবৈতনিক বিশেষজ্ঞরূপে তিন মাসের ভিতর সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আগ্রা জলকল উন্মোচনের উপযোগী করিয়া দিলেন। এই কঠিন কার্য্য-সাধনে, জলকলের কার্য্য সম্বন্ধে প্রধান বিশেষজ্ঞ, সাতিশয় বিশ্বস্ত কণ্ট্রাক্টর ও উচ্চ-হৃদয় ভদ্রব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেন।

১৮৯২-৯৫—এলাহাবাদ জলকলের মত, ওয়াল্‌স লভেট কোম্পানীর নামে ও তদনুরূপ সর্ত্তে কানপুর জলকলের কণ্ট্রাক্ট-লাভ ও কার্য্য-সম্পাদন। এই কোম্পানীর প্রধান অংশীদার, বাঙ্গালী কণ্ট্রাক্টরকে এক-তৃতীয়াংশ লভ্যাংশ দিতে আপত্তি করায়, অ্যাকুইন মার্টিন সেই কোম্পানীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, রাজেন্দ্রনাথকে সমান অংশী-দাররূপে লইয়া মার্টিন কোম্পানী নামক নূতন কোম্পানী গঠন করিলেন (১৮৯২ সাল)। কিছুদিন পরে টি, সি, মুখার্জ্জি কোম্পানীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও, নবপ্রতিষ্ঠিত মার্টিন কোম্পানী মীরাট, নাইনিতাল, বেনারস ও লক্ষ্ণৌএর জলকলসমূহের এবং লক্ষ্ণৌএর বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী সমূহের নির্ম্মাণ কণ্ট্রাক্ট পাইলেন।

অ্যাকুইন মার্টিনের 'নাইট' (knight) পদবী লাভ উপলক্ষে রাজেন্দ্রনাথ অতীব আনন্দিত হইয়া, স্বেচ্ছায় মার্টিন কোম্পানীতে নিজ আট আনা অংশ হইতে আধ আনা অংশ প্রিয়বন্ধু স্যর অ্যাকুইনকে অভিনন্দন হিসাবে চিরকালের জন্য অর্পণ করিলেন, এবং এই অপূর্ব্ব উপহার দানের সহিত তাঁহাকে প্রধান অংশীদার বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই মহানুভবতায় স্যর অ্যাকুইন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং উভয়ের ঘনিষ্ঠ স্নেহের সম্পর্ক দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। স্যর অ্যাকুইন মৃত্যুকালে উইল দ্বারা রাজেন্দ্রনাথকে নিজ সম্পত্তির একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক করিয়া গিয়াছিলেন।

২০ নম্বর বিডন ষ্ট্রীটে বিস্তৃত উদ্যানসমেত প্রাসাদোপম অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, এবং তাহার আশ্চর্য্য উন্নতি ও পরিবর্দ্ধন করিয়া, প্রায় ২০ বৎসর তথায় বসবাস করেন। বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় মনীষিগণের ও সম্ভ্রান্তবংশীয় সুরুচি ও শিষ্টাচারে উন্নত ব্যক্তিগণের সমাগমে এবং তাঁহাদের সরস সদালাপে ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় এই প্রসিদ্ধ সামাজিক কেন্দ্র অবিরত মুখরিত থাকিত।

১৮৯৫-১৯০০—অতঃপর জলকলসংক্রান্ত বৃহৎ কার্য্যের প্রয়োজন শেষ হওয়ায়, ঐকান্তিক গভীর চিন্তার ফলে রাজেন্দ্রনাথ বঙ্গে লাইট রেলওয়ে নির্ম্মাণের পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। তদনুসারে মার্টিন কোম্পানি, কার্য্য-নির্ব্বাহক প্রতিনিধি (Managing Agents) রূপে, গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ও যৌথ কারবারসূত্রে, ক্রমান্বয় হাওড়া-আম্‌তা-সেয়াখালা, রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর, বারাসাত-বসিরহাট, ব্যক্তিয়ারপুর-বেহার ও আরা-সাসারাম লাইট রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলেন। এই সমস্ত রেলওয়ে প্রথম হইতেই লাভজনক হইয়া দাঁড়াইল। মূল কল্পনার জন্য সমস্ত সুনাম রাজেন্দ্রনাথের প্রাপ্য। পরিশেষে ঈর্ষ্যান্বিত ইউরোপীয় বণিক্‌বর্গের প্ররোচনায় গভর্ণমেণ্ট পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহৃত হইলে, মার্টিন কোম্পানীকে লাইট রেলওয়ে নির্ম্মাণ বন্ধ করিতে হইল।

১৯০০-১৯২০—আবার নিবিষ্ট মনে নূতন কল্পনা উদ্ভাবন করিয়া, রাজেন্দ্রনাথ সহকর্ম্মী অংশীদারকে অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-স্থাপত্যে অগ্রণী হইবার প্রচেষ্টায় সম্মত করাইলেন। তদুদ্দেশ্যে স্যর অ্যাকুইন মার্টিন, থর্ণটন্ নামক প্রতিভাবান্ স্থপতি-শিল্পীকে বিলাত হইতে ভারতে আনয়ন করিলেন। থর্ণটনের মৌলিক ও মনোরম পরিকল্পনা অনুসারে সুগঠিত প্রাসাদসমূহ দ্বারা, মার্টিন কোম্পানি কলিকাতা ও অন্যান্য সহর সুশোভিত করিয়া দিলেন। এই কোম্পানি কর্ত্তৃক

কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ নির্ম্মাণে, এই শ্রেণীর উচ্চকার্য্যের, এবং স্যর রাজেন্দ্রের স্থপতি-জীবনের গৌরবময় পরিণতি হইল। বিংশ শতাব্দীর তাজসদৃশ ও "মর্ম্মর স্বপন প্রায়" এই অপূর্ব্ব স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের কণ্ট্রাক্টলাভে স্যর রাজেন্দ্রের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও অসামান্য চিন্তাশক্তি প্রধান কারণরূপে বিদ্যমান ছিল।

১৯০৬—স্যর অ্যাকউইন মার্টিনের পরলোক গমনে মার্টিন কোম্পানির প্রধান অংশীদার ও অধ্যক্ষ হইলেন।

১৯২৭—হাওড়ার বর্ণ কোম্পানির সুবৃহৎ ও প্রসিদ্ধ কারবার ক্রয় করিয়া মার্টিন কোম্পানির সহিত যোগ করিয়া দিলেন।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া উচ্চ অবৈতনিক পদে বা অন্যরূপে, জনসাধারণের কার্য্যে স্যর রাজেন্দ্রের আত্ম-নিয়োগের তালিকা ঃ—

১৯১০—এলাহাবাদে শ্রম-শিল্প ও অর্থনৈতিক সমিতির সভাপতি ; তাঁহার প্রদত্ত ও সুচিন্তিত বক্তৃতাসূত্রে ছয় বৎসর পরে শ্রম-শিল্প কমিটি গঠন।

১৯১১—কলিকাতার সেরিফ।

১৯১৬-১৮—ভারত-সম্রাট্ নিযুক্ত শ্রম-শিল্প কমিটির মেম্বর ও কয়েক মাসের জন্য তাহার প্রেসিডেণ্ট।

১৯২১—রেলওয়ে কমিটির মেম্বর।

১৯২২—ভাগীরথী-সেতু (Hooghly Bridge) কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

১৯২৩—বঙ্গীয় ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

১৯২৪—ভারত-সম্রাট্ নিযুক্ত ভারতীয় ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির মেম্বর।

১৯২৪-২৫—ভারতীয় কয়লা-কমিটির (Indian Coal Committee) মেম্বর।

১৯২৫-২৬—ভারত-সম্রাট্ নিযুক্ত ভারতীয় মুদ্রানীতি ও আয়ব্যয় (Currency and Finance) সম্বন্ধীয় কমিটির মেম্বর।

এতদ্ব্যতীত শিল্প-শিক্ষা বিষয়ে ও দ্রব্য-বহন (Transport) কমিটিতেও গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতার আতুরাশ্রমের এবং অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি-বিধায়ক সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

সাধারণের শিক্ষার—বিশেষ নারী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক রূপে প্রভূত দান; মিসেস্ পি, কে, রায় প্রবর্ত্তিত গোখ্‌লে মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে অমূল্য পরামর্শ ও সাহায্যদান।

শরীর-চর্চ্চার বিশেষ উৎসাহদাতারূপে বঙ্গীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট।

বালকদিগের মনে সেবা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার (Service

and discipline) আদর্শ বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য, কলিকাতা বয় স্কাউট অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্টরূপে দশ বৎসরের উপর কার্য্য করিয়া ভারতে সর্ব্বপ্রথম রজত-বৃক (Silver wolf) মেডেল পুরস্কার পাইয়াছেন (১৯৩১)।

সমানের মত ভারতীয় ও ইউরোপীয়দিগের অবাধ সামাজিক মিলনের জন্য কতিপয় ভারতীয় ও ইউরোপীয় বন্ধুগণের সহিত একযোগে কলিকাতা ক্লাব স্থাপন। দুই বার তাহার নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

ভারতের ইন্‌জিনিয়ারিং (Institute of Engineers) সভার প্রেসিডেণ্ট। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (Indian Science Congress) প্রেসিডেণ্ট। বঙ্গীয় এসিয়াসংক্রান্ত সভার (Asiatic Society of Bengal) প্রেসিডেণ্ট। দুই বৎসরে অবনতিশীল সভার বিশেষ উন্নতি সাধন।

ভারতের ও বঙ্গের শাসন পরিষদে (Executive Council) বার বার মেম্বর হইবার ইঙ্গিত বা প্রস্তাব পাইয়া ব্যক্তিগত কারণে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হ'ন। বিলাতে গোল-টেবেলেও একাধিক বার ডেলিগেটরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইবার অক্ষমতা প্রকাশ করেন।



অশীতিতম জন্মোৎসবে স্যর রাজেন্দ্রনাথ

রাজেন্দ্রনাথের উপাধি-তালিকা

রাজদত্ত—সি, আই, ই (১৯০৯) ; কে, সি, আই, ই (১৯১২) ; কে, সি, ভি, ও (১৯২২) ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত—ডি, এস, সি, ইন্‌জিনিয়ারিং (Honoris Causa)

ভারতের ইন্‌জিনিয়ারিং সভা প্রদত্ত—এম্, আই, ই, (ইণ্ডিয়া) ।

বিলাতের যান্ত্রিক (Mechanical) ইন্‌জিনিয়ারিং সভা প্রদত্ত—এম্, আই, এম্, ই, (ভারতে প্রথম ও একমাত্র Honorary Life Member) ।

বঙ্গীয় এসিয়াসংক্রান্ত সভা প্রদত্ত—এফ, এ, এস, বি ।

সমস্তগুলি উপাধি লইয়া তাঁহার নাম এইরূপে লিখিত হয় :—

Sir Rajendra Nath Mookerjee, K. C. I. E., K. C. V. O., D. SC., M. I. E. (Ind.), M. I. M. E., F. A. S. B.